অক্টোবর-ডিসেম্বর 1999

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | দাম সাড়ে সাত টাকা

আদি সমাজের নব-মূল্যায়ন

অহং মার্কসবাদ পরিবেশ

পরিবেশ আইনের সীমাবদ্ধতা

বিশ্ববাণিজ্য বৈঠক

সহমর্মিতার নানা রূপ

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ *21* সংখ্যা *3* □ অক্টোবর-ডিসেম্বর *1999*

সূচিপত্র

আমাদের কথা ... *1*
অহং-এর সীমাবদ্ধতা, মার্কসবাদ ও প্রকৃতি ... *2*
আদি সমাজ কি সত্যিই বিপন্ন ছিল ... *5*

স্মরণ
প্রিয় পরিমলদা স্মরণে ... *11*

অন্য চিকিৎসা ... *12*
বিষয় : পরিবেশ *[তৃতীয় পর্ব]*
পরিবেশ আইনকানুন... ... *16*

রিপোর্ট
কলকাতার নিকাশি খাল ... *21*
পুকুরচুরিতে বাদ সাধল বিজ্ঞানক্লাব ... *22*
ঝিল রোডের শেষ ঝিল ... *23*

পরিক্রমা
'রাস্তা কারো একার নয়'... ... *23*
দৈনিক মাত্র চার-শ টাকার জন্য এত ... *24*
জয়শ্রী ও তাকে ঘিরে আর সকলে ... *25*
বড়ই মজা জার্মানির বাচ্চাদের ... *26*

ঘটনা প্রবাহ
একজন শিক্ষকের কাহিনী ... *27*
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈঠক... ... *27*

পুস্তক পর্যালোচনা ... *29*

চিঠিপত্র ... *31*

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
P 252, লেকটাউন, ব্লক *A*
কলকাতা *700 089*

আমাদের কথা

এই সংখ্যায় *বিওবি*-র একুশ পূর্ণ হলো। যখন নতুন বছর, নতুন শতক, নতুন মিলেনিয়াম ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক চলছে, তখন বাইশে পা দেবার মুখে *বিওবি*-র নিজস্ব স্বগতোক্তি থাকতেই পারে।

হ্যাঁ, *বিওবি* একটু আনপথেই চলে। বাইরে যখন তারস্বরে কোনো কিছুর গুণগানে চারদিক মুখরিত, *বিওবি* তখন এটা ওটা প্রসঙ্গ তুলে একটু ভাবতে ও ভাবাতে চেয়েছে বরাবর। এবং তার যোগসূত্রের বিষয়টি হলো বিজ্ঞান ও সমাজ। যাবতীয় জাতীয় সমস্যা-সংকটের সমাধান হয়ে যাবে বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে, এ-ধরণের 'বিজ্ঞানবাদী' নয় *বিওবি*। আবার সব কিছুই আমাদের ছিল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের নতুন কিছুই দিতে পারে না—এমন কট্টর 'আমরা-বাদী'ও নয় *বিওবি*। বিজ্ঞান মানে শুধু কৃৎকৌশল নয়, বিজ্ঞান নয় শুধু শস্ত্র বা অস্ত্র, তত্ত্ব বা তন্ত্র, বিজ্ঞান যে একটা মানসিকতা, দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনচর্চা এটা আমরা খেয়ালে রাখতে চেয়েছি। ভুলতে চাই নি যে, চটজলদি সমস্যা সমাধানে কিছু যন্ত্র বা কৌশল আমদানি করলেই সমস্যা মিটে যেতে পারে না। যে বিজ্ঞান মানুষের মনোজগতে সংকীর্ণতা, আধিপত্য, ঈর্ষা-দ্বেষ-হিংসার বিস্তার ঘটায় সেটা বিজ্ঞান নয়, যে বিজ্ঞান বৈচিত্র্যকে ধারণ করতে পারে না, বিচিত্র ইকোসিস্টেমে মানুষের অবস্থানকে যে বিজ্ঞান স্বীকার করতে চায় না বা সেখান থেকে সমৃদ্ধ হতে পারে না, সে আর যাই হোক বিজ্ঞান নয়।

আমরা হয়তো মিলেনিয়াম মহিমা গেয়ে শতাব্দীকে ছোটো করতে চাই, শতাব্দী হয়তো একটি বছরকে বিন্দু করে দিতে চায়, কিন্তু চাইলেই কি তা হয়? কোন্ বিজ্ঞান-কারিগরি মুছে দিতে পারে বাবরি বা পোখরান, কারগিল বা বিমান ছিনতাই, ঘূর্ণিঝড় বা বাণিজ্য-বিশ্বায়ন? বিশ্বায়ন কি শুধু বাণিজ্যের, বিভিন্ন দেশের সুবিধাভোগীদের জোটবাঁধার, বৈচিত্র্য ধ্বংসের বীজ ছড়ানোর? কেন বিশ্বায়ন হতে পারে না, দারিদ্র্য দূর করার, অতিলোভী অতিভোগীদের রাশ টানার? বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের সাম্য সৌন্দর্য সম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখার আন্তর্জাতিক প্রয়াসের? সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বোধের প্রসারের? মানুষকে অমানুষ না করার?

এই অনুসন্ধানের কোনো শেষ নেই, নেই কোনো বছর, শতাব্দী বা সহস্রাব্দের সমাপ্তিতে ছেদ টেনে পুরনোকে ভুলে গিয়ে অনাগত অনিশ্চয়তার জয়গান গাওয়া। এই অনুসন্ধান অবিরাম—সূচনাহীন ছেদহীন সীমাহীন—যতদিন মানুষ ছিল, থাকবে।

আমরা হয়তো বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাব। ভেসে উঠবে অন্য বুদ্বুদ। তাই-ই তো প্রবহমাণতার ধর্ম। চিন্তা-চেতনাই মনুষ্যত্বের ধর্ম, যেখানে সবকিছুই গ্রাহ্য, কোনো কিছুই ব্রাত্য নয়। মহান বা অতি-উপেক্ষিত যদি সমানভাবে অনুসন্ধান উদ্রেক করে তবে হয়তো আমরা পৌঁছবই কোনোদিন সেই কাঙ্ক্ষিত বিশ্বসমাজে। আর সে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত বিশ্বায়ন আসলে দুর্বৃত্ততার বিশ্বায়ন, দস্যুতার বিশ্বায়ন, আধিপত্যের বিশ্বায়ন। □

অহং-এর সীমাবদ্ধতা, মার্কসবাদ ও প্রকৃতি

রজার এস. গটলিয়েব

রজার এস গটলিয়েব (Roger S. Gotlieb)-এর রচনা-র তৃতীয় কিস্তির (Marxism, Nature & the Limitations of the Ego) *-অনুবাদ নীচে উপস্থিত করা হলো। আগের দুই সংখ্যার বিওবি-তে প্রকাশিত দুই কিস্তি-র শিরোনাম ছিল, যথাক্রমে 'আমূল পরিবর্তনকামী রাজনীতি ও অহং' এবং 'কষ্ট, ক্রোধ ও আমূল পরিবর্তনকামী রাজনীতি'। ষাট-এর দশকে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ছাত্র ও যুব আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গটলিয়েব তাঁর অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের আলোতে মার্কসবাদ-এর পুনর্মূল্যায়নমূলক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ঐ পুস্তকের "মার্কসবাদ ও আত্মিকতা"* (Marxism and Spirituality) *শীর্ষক অধ্যায়টিরই বিভিন্ন অংশের অনুবাদ বিওবি-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রতিটি অংশই স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও এরা পরস্পরের সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্কিত। স.ম.*

আজকের সভ্যতা ধরণীকে বিষাক্ত করে তুলছে ও প্রাণের যে জটিল ও ভঙ্গুর জাল তার ভারসাম্য নষ্ট করে চলেছে।

পরিবেশ-এর এই সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য মার্কসবাদ কি যথেষ্ট?

মার্কসবাদ-এর অন্তত কিছু কিছু ধারণার সাহায্য না নিলে পরিবেশ-এর বিপন্নতাকে বোঝা স্পষ্টতই সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্নতা (alienation), পণ্যকেই উপাস্য দেবতা বানানো (fetishism of commodities), সবকিছুকেই পণ্যে রূপান্তরিত করা ও (প্রযুক্তির) তথাকথিত যুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠন (rationalisation), ইত্যাদি ধারণা পরম্পরাগত ও পশ্চিমী মার্কসবাদের আওতাতেই বিকশিত হয়েছে। এইসব ধারণা খুবই নির্ভুলভাবে এই সংকটের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে আঙুল তুলে ধরে। এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে :

- ☐ যেভাবে মানুষের নিজের ক্ষমতা ও কার্যকলাপই মানুষের প্রাণ বিনষ্ট করেছে। (বিচ্ছিন্নতা)
- ☐ যেভাবে প্রচণ্ডরকম উন্নত ও সূক্ষ্ম একটা প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া অবস্থান করছে এমন এক সামাজিক কাঠামোর পরিসরে, যা এতই যুক্তি-বিবর্জিত যে, প্রায় তা পাগলামোর পর্যায়ে পড়ে। (প্রযুক্তির যুক্তিসঙ্গত পুর্নগঠন)।
- ☐ যেভাবে উৎপাদন ও ভোগের যে ছাঁদ তার এক নিজস্ব জীবন আছে বলে মনে হয়, যা আপাতভাবে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যদিও উৎপাদন ও ভোগ দুইই মানুষই করে থাকে। (পণ্যকে উপাস্য দেবতা বানানো)।
- ☐ জটিল পরিবেশব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান যেভাবে বস্তুমাত্রে পর্যবসিত হয়—যার গুরুত্ব যাচাই-এর একমাত্র ক্ষেত্র হচ্ছে বাজারদর (পণ্যে রূপান্তরিত হওয়া)।

আরও সাধারণভাবে বলতে গেলে পুঁজিবাদী বিকাশের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মার্কসবাদী ও নয়া-মার্কসবাদী বিশ্লেষণে পরিবেশ সংকটের একধরণের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদের প্রবণতা রয়েছে দ্রুত নিয়ন্ত্রহীন সম্প্রসারণের দিকে। এই প্রক্রিয়ায় নগরায়ণের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলি মুছে যায় এবং কৃষিকাজের পরম্পরাগত রূপ বদলে গিয়ে সেটা শিল্প খামারে (factory farm) পরিণত হয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রয়োজন গণস্তরে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার। সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বকেও রপ্তানি-মুখী আধুনিক কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। সংকটের এগুলিই হলো মূল উপাদান এবং মার্কসবাদ সেগুলিকে ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করেছে। তাছাড়াও প্রকৃতির ওপর পুঁজিবাদের বিধ্বংসী ফলাফল সম্পর্কে মার্কস এবং এঙ্গেলসও লিখেছিলেন। কখনও কখনও তাঁরা এমনকি এও বলেছেন যে, মানবসমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক অর্থে একটা সংযোগ রয়েছে।

টুকরো টুকরোভাবে হলেও এবং খুব বেশি বিস্তারে না গিয়েও বিভিন্ন পশ্চিমী মার্কসবাদী[1] আরও গোড়াতে পৌঁছেছেন এবং এই দাবি করেছেন যে, শুধু প্রয়োগেই নয়, পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকৃতি রয়েছে তার অন্তর্বস্তুর মধ্যেই। আধুনিক বিজ্ঞানের সাফল্য সত্ত্বেও, সেই বিজ্ঞানের ধারণায় প্রকৃতির যে আদল

রয়েছে সেটা গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ। সেই আদর্শ অনুযায়ী প্রকৃতি রয়েইছে এইজন্য যাতে মানুষ তার ওপর প্রভুত্ব করতে পারে। প্রকৃতিকে প্রভুত্ব স্থাপনের লক্ষ্য হিসেবে দেখলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্যভাবে মানুষকেও সেই একই আলোতে দেখতে চায়। কলকারখানা, যুদ্ধক্ষেত্র, হাসপাতাল, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-সর্বত্রই মানুষজনকে এমনভাবে নড়ানো-চড়ানো হয় যে, মানুষ যেন শুধু বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের উপকরণমাত্র। আর মানুষকে এভাবে ব্যবহার করাটাই 'বৈজ্ঞানিক' প্রয়োগ-বিধির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। যতই আমরা প্রকৃতির ক্ষমতা থেকে মুক্ত হচ্ছি, ততই যে ব্যবস্থা এই 'মুক্তি' আনছে, সেই ব্যবস্থাই আমাদেরকে তার দাস বানাচ্ছে—সামাজিক ও মনোজগৎ উভয় দিক থেকেই। এই যে ফলাফল সেটা যেন 'যুক্তিভিত্তিক সমাজের যুক্তিবোধকেই সেকেলে বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে।'

মারকিউস [একজন অতি সুপরিচিত পশ্চিমী নয়ামার্কসবাদী —অনু.] আরও বলেছেন যে, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য-র বদলে তাকে যদি মুক্ত করার পথ খোঁজা যায় তবে বিজ্ঞানে রূপান্তর ঘটবে। এইধরণের মুক্তির অর্থ হলো :

> প্রকৃতির মধ্যে জীবনবিমুগ্ধকারী যেসব শক্তি আছে তার পুনরুদ্ধার— অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, সৌন্দর্য-বোধ জাগানো গুণাবলী। অন্তহীন প্রতিযোগিতায় যে জীবন অপচয়িত হয়, তার কাছে এইসব বোধ নিতান্তই ভিনদেশী ঠেকবে। এসবের মধ্য দিয়ে নতুন গুণসমৃদ্ধ এক *মুক্তির* ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পুঁজিবাদ এই ধরণের যে কোনো প্রকল্পকে খারিজ করে দেয়। কারণ, পুঁজিবাদ ধরেই নেয় যে 'প্রকৃতি রয়েইছে, যাতে তার ওপর আধিপত্য করা যায়'। কিন্তু,

> এক মুক্ত সমাজের আগাম ভাবনা ও লক্ষ্য খুবই আলাদা হতে পারে। প্রকৃতি-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা এরকম হতে পারে যে, প্রকৃতি হলো এক প্রাণময় সামগ্রিকতা, যাকে রক্ষা করতে হবে ও যার বিকাশে সহায়তা করতে হবে। এবং এই অভিজ্ঞতাই হতে পারে বৈজ্ঞানিক ধারণার ভিত্তি। প্রযুক্তি তখন এই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করবে প্রাণের পরিবেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে।

সম্প্রতি (1988) মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ জেমস্ ও 'কোন্নোর (James O'Connor) এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ নিজের টিকে থাকার শর্তগুলিরই ক্ষতি করে চলেছে। ফলে পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলি নিজেরাই অধিকতর রাজনৈতিক বিধিনিষেধ অবশ্যই আরোপিত হতে দেবে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের পরিবেশগত ফলাফলকে নজরদারির আওতায় আনার আরও বেশি বেশি ক্ষমতা রাষ্ট্র ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ওপর এভাবেই বর্তাবে। ও'কোন্নোর-এর 'পরিবেশ পন্থী' মার্কসবাদে-র মতে, সামাজিক পরিবর্তনের নানা বাহন আর শুধু পরম্পরাভুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে নেই। পরিবেশকে বাঁচানোর চেষ্টায় নিযুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীও এই বাহনের কাজ করছে।

মার্কসবাদী চিন্তার এইসব অবদান সত্ত্বেও একথা আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, প্রকৃতির প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি মানবসমাজের যে আচরণ সেই দুই আচরণের মধ্যে সম্পর্কের ওপর মার্কসবাদ খুব সুসংবদ্ধভাবে কোনো তদন্ত করে নি। পরিবেশের ওপর মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর যে মন্তব্য, সেটা তাদের মূল রচনায় প্রান্তিক গুরুত্ব পেয়েছে মাত্র (পরিবেশ সংকট ঘনীভূত রূপ নেবার আগেকার যুগের মানুষদের কাছ থেকে তা-ই আশা করা যায়)। বহু বামপন্থী সমালোচকের চোখেই মার্কসবাদী তত্ত্ব ও প্রয়োগে পরিবেশ-সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তার দৈন্য নিতান্তই প্রকট।..........

আমার এখানে যা উদ্দেশ্য তার দিক তেকে বেশি দরকারী কথা হলো এই যে পরিবেশগত সংকটকে ঠিকমতো বুঝতে হলে ও উপযুক্তভাবে তাতে সাড়া দিতে হলে অহং সম্পর্কে একটা মূল্যায়নের দরকার, দরকার মনুষ্যজীবনের এমন এক আদর্শ, যা অহংকে অতিক্রম করে যাবে।

এরকমভাবে দেখাই যেতে পারে যে, আধুনিক ভোগবাদের (consumerism) জড় নিহিত রয়েছে একচেটিয়া পুঁজি-র প্রয়োজনের মধ্যেই। *কিন্তু আমার কি আছে কেবল তারই সঙ্গে একাত্মবোধ করার বদলে, তার জায়গায় অন্যকিছুকে যদি বসাতে শুরু না করি, তো ভোগের ওপর নির্ভরতার অন্ধগলি থেকে আমরা কিভাবে বেরুব?* আমরা নিজেরা আসলে যা তারই দরুণ, অর্থাৎ আমাদের নিজত্বের দৌলতেই যদি পুঁজিবাদের সঙ্গে আবদ্ধ থেকে থাকি, তবে সেই মানসিক সম্পদ— ধারণাগত, বাস্তবানুগ, মতাদর্শগত—আমরা কোথায় খুঁজে পাব, যা আমাদের মুক্ত করবে? মার্কসবাদী তত্ত্ব বহুদূর পর্যন্ত অহংকে স্বীকার করেই চলে থাকে। 'সামাজিক ব্যক্তি' ও যৌথ মালিকানার ওপর এত বিশ্বাস সত্ত্বেও মার্কসবাদ প্রায়ই অনুক্তভাবে নিজত্বের সেই ব্যক্তিতান্ত্রিক আদর্শকেই মেনে নেয়, যা গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতকের উদারনীতিবাদের প্রভাবে। ফলে অহং-এর পরিবর্তনকে 'বিপ্লবের পর'-এর জন্য মুলতুবি রাখা ছাড়া মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের গত্যন্তর নেই। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দল, গণতান্ত্রিক বিভিন্ন দলের মধ্যে বামপন্থী

চক্র ইত্যাদি সবাই যে দাবি করে যায় তাহলো অধিকতর সরকারি হস্তান্তরকরণ, বেশি মজুরি, বেশি পরিষেবা, আরও বেশি বেশি জিনিস। সেদিক থেকে বামেরা যা অনুশীলন করেন, তাকে বলা যায় হক্‌দার করে তোলার, বা *হক্‌দারত্ব-র* (entitlement) নীতি, যেখানে হক্ কতটা হলো তা মাপা হয়, আয় ও সামাজিক পদমর্যাদা দিয়ে (যেমন শিক্ষা বা পেশাগত সুযোগ-সুবিধা)। *ভোগ কমিয়ে আনার* কোনো কার্যক্রম মার্কসবাদী বা সমাজবাদীদের দ্বারা কোনোকালেই সম্ভব হয় নি, সম্ভব হয় নি ঠিক এই কারণেই যে, অহং-কে পুরোপরি তৃপ্ত করার যে দায়বদ্ধতা বামপন্থীরা সাধারণত বোধ করে, ঐ ধরণের কোনো কার্যক্রম তাতে বাদ সাধবে। অথচ পরিবেশ-কে মান্য করে চলে এমন যে কোনো বিপ্লবী আন্দোলন বা বিপ্লব পরবর্তী সরকারের দরকার হবে ভোগের বর্তমান চেহারা ও ব্যাপ্তিকে বদলানো ও সীমাবদ্ধ করা। লোভের ও ভোগ্যবস্তুর ওপর মানসিক নির্ভরতার বদলে বরং এমন জীবন আচরণকে যদি গণ-আন্দোলনগুলো তুলে না ধরে, যার ভিত্তি হবে গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা বোধ, তবে ভোগের ইচ্ছার সীমিতকরণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

অধিকন্তু, মানুষের ইতিহাসকে যৌথ লড়াই ও বিরোধিতা হিসেবে দেখাটা, মার্কসবাদের পক্ষে চিরকালই অত্যাবশ্যক হয়ে আছে। তবুও শ্রেণী-আধিপত্য পরিবেশ সংকটের একটা অংশ হলেও, সেটা একটা অংশই। যে অতি-বেগনী রশ্মি 'ওজোন' স্তরকে ফুটো করে দিয়ে ঢুকে পড়ছে, ক্যান্সার-এর যে প্রায় মহামারী রূপে আবির্ভাব, দূষিত বাতাস, নানা ধরণের উৎস থেকে উৎসারিত বিষাক্ত বর্জ্যপদার্থ—এ সবেরই সম্ভাবনা রয়েছে এমন এক সংহতি গড়ে তোলার, যা লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি এমনকি (খানিকদূর অবধি) শ্রেণীভিত্তিক বিভেদকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে গড়ে উঠতে পারে। শ্রেণী চেতনার সাথে আজ দরকার বিশ্বজনীন (Global) চেতনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক লক্ষ্যকেই ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না, বরং গড়ে ওঠে পরস্পরের সাথে জড়িয়ে থাকা জীবন জালে অংশীদারত্বের যে বোধ তার ভিত্তিতেও। এক ব্যক্তিতান্ত্রিক অহং-এর পক্ষে বিশ্বজনীন চেতনা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার অন্যদের সাথে এবং নিজের গভীরতম সত্তার সাথেও সংলাপ চালাবার সামর্থ্য, যা সংঘাত ও বৈরিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে আমূল পরিবর্তনকামী রাজনীতি, তার থেকে বেরিয়ে আসে না। সক্রিয়তা, রূপান্তর ইত্যাদিকে মার্কসবাদী ঢঙে আদর্শায়িত (idealisation) করে তোলার সাথেও এরকম সামর্থ্য পুরোপরি সংগতিপূর্ণ নয়। নজর রাখা, অপেক্ষা, সংলাপ, মনের দরজা খুলে রাখা, অন্যসত্তার সাথে একাত্মতা—এইসব সামর্থ্য-কে সাধারণভাবে আমূল পরিবর্তনকামী রাজনীতিতে ও বিশেষভাবে মার্কসবাদে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 'কেমন হওয়া উচিত', সে সম্পর্কে আমাদের মনে যে ছবি আছে তার সাথে দুনিয়াকে খাপ খাওয়াতে বাধ্য করার বিপরীতে নিজের ভেতরে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা এমন একটা কিছু, যার সাথে মার্কসবাদীরা কখনই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে নি। অথচ আমরা যদি এই সামর্থ্য-র চর্চা না করি তবে পরিবেশকেন্দ্রিক কাজকর্ম কেবল সারে সারে কিছু সাময়িক সংস্কার কার্যে রূপান্তরিত হবে মাত্র এবং সম্ভবত সেই সংস্কারগুলি খুব কার্যকরও হবে না। বর্তমানের দিকে মন খুলে রাখা, অন্যদের প্রতি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি সংবেদশীলতা— এ সবের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক বিশ্বজনীন সচেতনতা আমাদেরকে এমন এক ষষ্ঠেন্দ্রিয় দেবে, যার সাহায্যে আমরা বুঝতে পারব পরিবেশগত দিক থেকে কোন্‌টা প্রাণের অনুকূল আর কোন্‌টা তা নয়।

---

1. পশ্চিমী মার্কসবাদীরা (Western Markists) : এই শব্দটির দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপের এমন সব মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের বোঝায়, যাঁরা এ দুই অঞ্চলের সমাজবাদ তথা মার্কসবাদী প্রয়োগের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কসবাদের নতুন নানা ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। কার্ল কোর্শ (Karl Korsch) ও গেয়র্গ লুকাস (Georg Lucás) বিশের দশকে এই ধারার প্রবর্তন করেন। পরের দশকগুলিতে আরও নানাজন তাকে আরও বিস্তৃত ও পরিপুষ্ট করেছেন। শুরু থেকেই এই ধারা তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের তাত্ত্বিকদের আক্রমণের সামনে পড়ে। এঁরাই ঐ ধারার তাত্ত্বিকদের 'পশ্চিমী মার্কসবাদী' (1920) নাম দেন।

অনুবাদ : **সুভাষ গাঙ্গুলী**

প্রিয় পাঠকদের প্রতি

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী-র

নতুন গ্রাহক সংগ্রহে আপনার

সহযোগিতা চাই।

আদি সমাজ কি সত্যিই বিপন্ন ছিল

শ্রীমতী মার্শাল শাহলিন্‌স্‌-এর প্রস্তরযুগ অর্থনীতি বইএর 'আদি সম্পন্ন সমাজ' প্রবন্ধটি অবলম্বনে নীচের লেখাটি তৈরি হয়েছে। বইতে উল্লিখিত তথ্যসামগ্রী সপ্তম দশকের শেষে প্রাচীন মানব সমাজ সম্পর্কে আমাদের কতগুলি মূল বিশ্বাসকে টলিয়ে দেয়। লেখাটি মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ জেলার 'একলব্য' নামের সংস্থার পত্রিকা শৈক্ষিক সন্দর্ভ পত্রিকার 1998 সালের মার্চ-জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এদের ঠিকানা : একলব্য, কোঠিবাজার, হোসাঙ্গাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, পিন 461001। লেখাটি হিন্দী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজন মনে হওয়ায় কিছু কিছু সংযোজন করা হয়েছে Man the Hunter *বই থেকে। বইটি সম্পাদনা করেছেন* Richard B. Lee *এবং* Irven Devore*। কিছু তথ্য* Science, Vol. 185 *থেকেও নেওয়া হয়েছে।*

আদিম যাযাবর শিকারি সংগ্রাহক মানুষেরা কৃষি বা পশুপালন করত না। প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করত। এদের সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস হলো—এরা অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে বেঁচে থাকত। এদের উৎপাদন কৌশল বা করণ-কৌশল এত নিম্নস্তরের ছিল যে, উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করেও তারা নিজেদের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারত না। এরা সব সময় ক্ষুধার্ত থাকত এবং ক্রমাগত খাদ্যের খোঁজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত। তাদের জীবনে পর্যাপ্ত উৎপাদনের অর্থ ছিল কোনোক্রমে বেঁচে থাকা। ফলে মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পরে তাদের হাতে বাড়তি সময় বা খাদ্যসামগ্রী কিছুই অবশিষ্ট থাকত না যাতে তার জীবনকে আরো উন্নত করতে পারে বা সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে পারে। এদের সম্পর্কে শুধু সাধারণ মানুষ না, ঐতিহাসিক-অর্থনীতিবিদেরাও এরকমই ভাবতেন; এদের লেখা বইগুলি থেকে আমরা সেকথা বুঝতে পারি। এ-যুগের মানুষদের সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *যে গল্পের শেষ নেই* বইতে লিখেছেন, 'হাতিয়ারগুলো নেহাতই বাজে ধরণের, আর সেই হাতিয়ার হাতে একজন মানুষ প্রাণপণ মেহনত করে পৃথিবীর কাছ থেকে যেটুকু জিনিস আদায় করতে পারে তার সবটুকুই তো খরচ হয়ে যায় কোনোমতে তার নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য।.... বাড়তি বলে কিছু নেই...... তাই এ অবস্থায় কারুর পক্ষেই অপরের মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস লুঠ করার কথা ওঠে না। লুট হয়ে গেলে, যার মেহনত সে বেচারা যে প্রাণেই মারা যাবে' অতএব,' সমানে সমান হয়ে বেঁচে থাকা। তবু মনে রাখতে হবে এই যে সমানে সমান ভাব এর আসল কারণ হলো অভাব, দৈন্য, সকলেই গরিব আর তাই সকলেই সমান।' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় 1951 সালে; 1997 সালে নবতম সংস্কারণ প্রকাশকালেও এই ভ্রান্ত ইতিহাস সংশোধিত হয় নি! বইগুলি পড়ে মনে হয় তারা সব সময় অবলুপ্তির দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকত। মানুষগুলি কিভাবে বেঁচে থাকত তা জানার আগ্রহ আমরা দেখাই নি বরং হীনদৃষ্টিতে এদের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি এটা কি মানুষের জীবন?

আমেরিকা এবং অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশকেই আমরা উন্নত দেশ বলি। আমাদের উন্নতির ধারণা যদি এই হয় তাহলে আদিম শিকারি সংগ্রাহক সমাজ বিপন্নতার চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু যাকে আমরা বিপন্নতা ভেবে এসেছি তা আসলে সম্পন্নতা নয় তো?

মানুষ ও সমাজের বিবর্তন সূত্রের সন্ধান

সেটা ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগ। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নে একের পর এক আবিষ্কার পশ্চিমী বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে মিশে জন্ম দিল শিল্প বিপ্লবের। অতঃপর প্রবল শক্তিতে পৃথিবীময় দাপিয়ে বেড়াল প্রযুক্তিনির্ভর পশ্চিমী সভ্যতা। বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের অপার ভয়-ভক্তিপূর্ণ মোহ তৈরি হলো। সবকিছুই হয়ে উঠতে চাইল বিজ্ঞানসম্মত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ জাগতিক-মহাজাগতিক-সামাজিক সমস্ত প্রক্রিয়ার কারণ তার গতির নিয়ম আবিষ্কার করে ফেলতে তৎপর হলো—নিউটন মাধ্যাকর্ষণ এবং গ্রহ নক্ষত্রের, ডারউইন জীবনের গতির নিয়ম আবিষ্কার করলেন। এভাবেই মানুষের মন এবং সমাজের গতির নিয়ম আবিষ্কার করার চেষ্টা শুরু হলো। অনেকেই মনে করলেন,

মানব সমাজ বিবর্তনেরও একটি সুনির্দিষ্ট এবং অনিবার্য ক্রম আছে। মানবেতিহাসকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হলো।

1. **আদিম সাম্যবাদী সমাজ :** এদের সম্পর্কে কি ভাবা হতো তার পরিচয় আমরা লেখার শুরুতেই পেয়েছি। অর্থাৎ এদের দুর্গতির সীমা ছিল না। তারা জন্মাত মাছির মতন, মরতও মাছির মতন। তারা বেশিদিন বাঁচত না। এ সময় যখন সে বাড়তি কিছু তৈরিই করতে পারত না *তখন তার কাছ থেকে উদ্বৃত্ত কেড়ে নেওয়াও সম্ভব ছিল না। ফলে শোষণ ব্যবস্থা চালু হয় নি। অতএব ছিল এক বাধ্যতামূলক সাম্য।* তখন কাউকে শোষণ করতে গেলে তাকে মেরে খেয়ে ফেলতে হতো। সে সময় নরমাংস খাওয়ার চলও ছিল।
2. **শ্রেণীবিভক্ত সমাজ :** তারপর একটা সময় এল যখন উৎপাদন কৌশলের বিকাশ ঘটল, মানুষ নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদন করতে শিখল। এই উদ্বৃত্ত ছলে বলে কৌশলে কেড়ে নিল সমাজের একাংশ। তারা নিজেরা কাজ করত না, অপরের শ্রম শোষণ করে আরাম আয়েস-পূর্ণ জীবনযাপন করত। এদের জীবনে অবসর ছিল আর এই অবসরকে ব্যবহার করে তারা বিজ্ঞান শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাল। সমাজের অগ্রগতি দ্রুততর হয়ে উঠল। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপাদিকাশক্তি এতটা বিকশিত হয় নি যে, সকলে যা চায় তাই উৎপাদন করা সম্ভব। ফলে সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ পেত কোনোক্রমে বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তাই, আর অল্পসংখ্যক মানুষ তাদের শোষণ করে প্রাচুর্য-পূর্ণ জীবন কাটাত।
3. **সাম্যবাদ :** এরপর করণ-কৌশল বা উৎপাদন-কৌশল এত বিকশিত হবে যে, প্রত্যেকের যা চাহিদা তা মিটিয়ে দেওয়া যাবে, পণ্য হয়ে উঠবে আলো বাতাসের মতন প্রচুর, সুলভ। জন্ম নেবে সাম্যবাদ।

আমাদের দৃষ্টিভ্রম

আদিম সাম্যবাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা উপরোক্ত সমাজ বিকাশের মডেলের একটি ভিত্তি। ষাট ও সত্তরের দশকের আদিবাসী আন্দোলন ও অন্যান্য উপলব্ধি উপরোক্ত মডেলকে ভেঙে দিল। শ্রেণী বিভাজিত হওয়ার আগের সমাজ দেখার সুযোগ যারা পেয়েছে তারা বলেছে যে, এদের হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত সময় রয়েছে, তারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু করে না। তাদের যা প্রয়োজন তা উৎপাদন করার পর বাড়তি সময় দিয়ে তারা কি করে? তারা আনন্দের সাথে সময় কাটায়। সঞ্চয় করা সম্ভব, শোষণ করা সম্ভব কিন্তু তারা তা করে না। তাই প্রশ্নটা এবার উল্টে গেল। কিন্তু এত দিন এমনকি প্রগতিশীল আন্দোলন ও প্রগতিশীল মানুষরাও যে কেন এই বাস্তবকে দেখতে পেল না সেটাই বিস্ময়ের।

একটি দৃষ্টান্ত : আফ্রিকার 'ট্কুংগ' গোষ্ঠী

মোটামুটি কুড়ি লক্ষ বছর হলো সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। এই সময়ের নিরানব্বই শতাংশই সে কাটিয়েছে শিকারি সংগ্রাহক হিসেবে। পৃথিবীতে আজ অব্দি আনুমানিক আট হাজার কোটি মানুষ জীবন অতিবাহিত করেছে। এদের নব্বই শতাংশই ছিল শিকারি সংগ্রাহক, ছয় শতাংশ কৃষিজীবী, বাকি চার শতাংশ শিল্পোন্নত সমাজে জীবন কাটিয়েছে।

শিকারি সংগ্রাহকরা বেশিদিন বাঁচত না এমন ধারণা চালু রয়েছে। কিন্তু সমীক্ষা করে দেখা গেছে, শিল্পোন্নত সমাজে এবং শিকারি সংগ্রাহকদের মধ্যে মোট জনসংখ্যা অনুপাতে বৃদ্ধদের অর্থাৎ ষাট-এর বেশি বয়সীদের সংখ্যা সমান। অর্থাৎ শিকারি সংগ্রাহকরা বেশিদিন বাঁচত না এই ধারণা ঠিক না। এখানে বয়স্ক লোকেরা দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার জন্য সমাজে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনও করতেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখা গেছে, একটি শিকারি সংগ্রাহক গোষ্ঠীর চারজন অন্ধ বা প্রায়-অন্ধ বৃদ্ধ যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। অভিজ্ঞতার সুবাদে রোগ উপশমের কাজও তাঁরা করতেন। শিকারি সংগ্রাহকদের মধ্যে 20-60 বছর বয়সীরাই প্রধানত প্রয়োজনীয় কাজগুলি করত। অল্পবয়সী এবং বৃদ্ধেরা সাধারণত খাবারের সন্ধানে বেরত না।

একটি বিশেষ অপুষ্টিজনিত রোগ যা আফ্রিকার কৃষিজীবী পরিবারের শিশুদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক তা এদের মধ্যে একটিও দেখা যায় নি। 'ট্কুংগ'রা দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহাড়ি মরুভূমি এলাকার একটি শিকারি সংগ্রাহক জনগোষ্ঠী। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ একটি খরার সময় এদের জীবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গেছে। সে সময় পরপর তিনবছর ফসল হয় নি। লক্ষাধিক গবাদিপশু জলাভাবে মারা গেছে। ইউনাইটেড নেশন থেকে ত্রাণও পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত কৃষিজীবী পশুপালকেরা ত্রাণের সুবিধে পায় নি। বিশেষ করে মরুভূমির মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায় ত্রাণ-সামগ্রী পৌঁছয় নি। তারা অনেকেই বিশেষত হেরেরো (Herero) এবং ত্সোয়ানা (Tswana) গোষ্ঠীর মহিলারা এসময় ট্কুংগদের সাথে মিশে খাদ্য সংগ্রহ করেছে। *সেই মরুপ্রকৃতিও ট্কুংগ*

ছাড়া বাড়তি মানুষকে খাদ্য যুগিয়ে রিক্ত হয় নি। ইদানিং যে সমস্ত ট্কুংগ বান্টুদের পাশাপাশি কৃষিজীবী গ্রামগুলিতে বাস করতে শুরু করেছে তাদের মেয়েরা দ্রুত সমানাধিকার, মর্যাদা খোয়াচ্ছে যা তারা আগে ভোগ করত। তাদের বাচ্চারা ক্রমশ উদ্‌গ্র আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে, জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে যেখানে তা ছিল স্থিতিশীল। শিকারি সংগ্রাহকদের মধ্যে তাদের বাচ্চাদের মধ্যে খেলাগুলি প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। দেখা গেছে, শিশুপালন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তারা নজর রাখে যাতে তাদের বাচ্চারা প্রতিযোগিতা-পরায়ণ উদ্‌গ্র-আক্রমণাত্মক হয়ে না ওঠে। তাদের জীবনে প্রতিযোগিতা-উগ্রতা-আক্রমণাত্মক আচরণের কোনো ভূমিকা নেই। এবং সচেতনভাবেই তারা এগুলিকে প্রতিহত করে। রিচার্ড লি কালাহাড়ি মরুভূমির ট্কুংগদের অধ্যয়ন করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন, কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়া বাধলে গোষ্ঠীর অন্যরা তাদের ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে। জয়ীকে বরমাল্য পরানোর জন্য কেউ বসে থাকত না।

তারা প্রধানত বিভিন্ন বাদাম-শাকসব্‌জি-ফলমূল এবং মাংস খায়, দানাশস্য বা দুধ খায় না। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মত অনুযায়ী, তারা সুষম খাদ্য খেত, তাদের মধ্যে এমনকি গর্ভবতী মহিলা এবং স্তনদায়িনী মায়েদের মধ্যেও রক্তাল্পতায় ভুগছে এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া গেছে। মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ফোলিক অ্যাসিডের ঘাটতি এদের মধ্যে দেখা যায় নি; অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় ভিটামিন বি-১২ এদের শরীরে বেশি রয়েছে। এই সমস্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে *নিউমেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক মনে করেছেন, 'প্রস্তরযুগের মানুষদের সম্ভবত ভিটামিন ঘাটতি-জনিত কোনো সমস্যা ছিল না। এর সূত্রপাত হয়েছে হয়তো মানুষ কৃষি পশুপালক জীবনে প্রবেশ করার পরে।'* তারা 60-80 বছর বয়স অব্দি বেঁচে থাকত, কিন্তু বার্ধক্য জনিত রোগভোগ—যেমন বয়সের সাথে সাথে রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া—তাদের মধ্যে দেখা যায় নি।

অনুন্নত উৎপাদনকৌশল বনাম মুনাফাকেন্দ্রিক উন্নত প্রযুক্তি

যদি বাস্তবকে অধ্যয়ন করা যায় তবে আদিম শিকারি সংগ্রাহক মানুষ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিপরীত একটি ছবিই বেরিয়ে আসবে। দেখা যাবে শিকারি সংগ্রাহকদের সমাজ মূলত সম্পন্ন সমাজই ছিল। অর্থাৎ ঐ সমাজের সকল লোকের ব্যাবহারিক প্রয়োজনগুলি অতি সহজেই পূরণ হতো।

অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন যে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা অসীম কিন্তু জোগান সীমিত থাকে। অর্থাৎ তাদের চাহিদা এবং জোগানের মধ্যে ব্যবধান থেকে বোঝা যায়, সমাজটি কতটা সম্পন্ন অথবা দরিদ্র। এই দূরত্বকে দুইভাবে কমানো যেতে পারে উৎপাদন বা জোগান বাড়িয়ে অথবা চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষাকে সীমিত রেখে। বাজারের ওপর নির্ভরশীল অর্থব্যবস্থাগুলি প্রথম পথ অনুযায়ী চলে আর শিকারি সংগ্রাহক সমাজগুলি দ্বিতীয় পথে চলে। আহরণকারীরা এই পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে নিজেদের প্রাচুর্য বজার রাখত। যদি আমরা এই ব্যাপারটা বুঝি তো আহরণকারীদের বিচিত্র আচরণকেও অনুধাবন করতে পারব। যেমন তাদের কাছে যে খাবার থাকত তা তারা ভবিষ্যতের কথা না ভেবে খেয়ে শেষ করে ফেলত। প্রাচুর্য থাকলেই কেবল এ-রকম আচরণ করা সম্ভব।

আসলে সংগ্রাহকদের সম্পর্কে আমাদের তৈরি ধারণাগুলির পেছনে আছে বাজার-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অভিজ্ঞতা। এই ব্যবস্থায় কোনো একজন ব্যক্তির সামনে থাকে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য-সামগ্রী। তার থেকে তাকে বেছে নিতে হবে কোন্‌টি সে কিনবে আর কোন্‌টি নয়। সে কিছু জিনিস কেনে, অনেক জিনিসই কিনতে পারে না কারণ তার সামর্থ্য সীমিত। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় কোনো জিনিস পাবার আনন্দের মধ্যে অন্য অনেক জিনিস না পাবার দুঃখ নিহিত থাকে। এই মানসিকতা নিয়ে যখন আমরা সংগ্রাহক সমাজের মানুষদের দেখি তাদের জন্য আমাদের দুঃখ হয়। আমরা ধরেই নিই যে, তাদের চাহিদাও আমাদেরই মতন। আর এরকম চাহিদা তো কখনই পাথরের যন্ত্র দিয়ে পূরণ হবার নয়! আমরা সিদ্ধান্ত করি, ওদের জীবন দারিদ্রপূর্ণ ; আমরা ভাবি, ওদের কত কষ্ট!

আমরা ভুলে যাই যে, অভাবের সাথে প্রযুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই, যদি আহরণকারীরা সীমিত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় তবে তীর ধনুক আর ঝুড়িই তাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

যে সব মানুষ বর্তমান কাল অব্দি টিকে থাকা শিকারি সংগ্রাহক গোষ্ঠীগুলিকে অধ্যয়ন করেছে কিন্তু তাদের জীবনকে বুঝতে পারে নি তারাই এই ধারণা ছড়িয়েছে যে, ওরা ক্ষুধার তাড়নায় মরে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে ইওরোপের যে লোকেরা গমের রুটি, সামান্য কয়েকরকমের তরকারি এবং মাংস খেতে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে শিকারি সংগ্রাহকদের খাদ্যাভাসকে বোঝা কখনই সম্ভব নয়। ওদের খাদ্যে অপরিসীম বৈচিত্র্য রয়েছে। তারা নানান রকমের বীজ, পোকা মাকড়, ফলমূল, ফুল, শাক-পাতা পাখি ও জন্তু জানোয়ারের মাংস আরো কত কি যে খায়! ঠেকায় পড়ে নয়, ভালোবেসে।

একজন ক্যাপ্টেন দেখেছিল অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা মাঝে মাঝে একটি বিশেষ গাছের আঠা জড়ো করে খাচ্ছে। তিনি লিখেছেন, বেচারিরা এত দুরবস্থার মধ্যে ছিল যে আর কিছু না

পেয়ে শেষপর্যন্ত এই গাছের আঠা খেতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু 1841 সালে অন্য একজন যাত্রী লিখেছেন, ঐ আঠা ওখানকার লোকদের একটি প্রিয় খাদ্য। আঠা তৈরির মরসুমে তারা সকলে একত্রিত হয়ে এই আঠা জড়ো করে ভাগাভাগি করে খায়। এই সময়ে তারা মিলিত হয় এবং গল্পগুজব করার সুযোগ পায়। তিনি আরো লিখেছেন '..... এখানকার আদিবাসীরা খুব ভালো করে জানে কোন্ মরসুমে কোথায় কি হয়। তারা এসব জিনিস জোগাড় করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিও জানে। এরা এমনভাবে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় ভ্রমণ করে, যাতে সেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী সহজেই মিলতে পারে। তাদের ঝুপড়িতে আমি সবসময় খাদ্য-সামগ্রীর প্রাচুর্যই দেখেছি।'

ব্যাবহারিক জিনিসপত্রের প্রাচুর্য

দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহাড়ি মরুভূমিতে ট্কুংগ লোকেরা থাকে। খাদ্য ব্যতিরেকে তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যাপারে শ্রীমতি মার্শাল লিখেছেন, 'প্রত্যেকের কাছে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস থাকে। আর দরকার পড়লে যে কেউ সেগুলি বানিয়ে নিতে পারে।.... তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেসব জিনিস থেকে তৈরি হয় তা তাদের চারপাশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যে কেউ যত-খুশি সেগুলি ব্যবহার করতে পারে—কাঠ, বেত ও হাড়গোড় যা দিয়ে তারা নিজেদের হাতিয়ার তৈরি করে, দড়ির জন্য আঁশ, কুঁড়ের জন্য ঘাস পাতা—উটপাখির ডিমের খোলা থেকে ট্কুংগ মহিলারা পুঁথির মালা বানায়। ঐ খোলগুলিকে তারা জল ভরার পাত্র হিসেবেও ব্যবহার করে। প্রতিটি মহিলা এই খোল যতখুশি পেতে পারে। তারা তো কেবল 10-12টি পাত্র নিয়েই চলাফেরা করতে পারে। তাদের ভ্রাম্যমাণ জীবনে খাদ্য এবং পানীয়ের প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয়। তখন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ছোট ছোট বাচ্চাদের বয়ে নিয়ে যেতে হয়। চারিদিকে প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রাচুর্য দেখে ট্কুংগ মানুষেরা সঞ্চয় ব্যবস্থার বিকাশ ঘটায় নি। একটি জিনিস দিয়ে কাজ চললে তারা কখনো সেই জিনিস দ্বিতীয়টি সঞ্চয় করে না। কিছু কিছু জিনিস তারা একটিও নিজের কাছে রাখতে চায় না, হয়তো তারা সেটা অন্যের কাছ থেকে ধার নেবে। এভাবে জমানো এবং প্রচুর জিনিস সংগ্রহ করা তাদের কাছে আমাদের মতন জীবন স্তরের (Standard of living) সূচক হয়ে ওঠে নি।'

অন্যান্য শিকারি সংগ্রাহক সমাজকে যারা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাও শ্রীমতি মার্শালের বক্তব্য সমর্থন করেছেন। তাঁরা দেখেছেন ধন-দৌলত ওদের যাযাবর জীবনের পক্ষে বাধা স্বরূপ। এইজন্য বেশিরভাগ আহরণকারী মানুষই কম জিনিস রাখতে চায়। এমন কি যেসব জিনিসপত্র তাদের কাছে থাকে তাও তারা ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করে না। তারা এগুলির প্রতি অত্যন্ত উদাসীন।

আমরা এদের গরীব ও বেচারা বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি কারণ এদের কাছে ধন-দৌলত কম আছে। যদিও আমাদের ভাবা উচিত ছিল, ধন-দৌলত কম থাকার জন্য ওরা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে—এর জন্যই জীবনকে তারা ভরপুর আনন্দের সাথে উপভোগ করতে পারে।

মৌলিক প্রয়োজন—খাবার দাবার

বহুদিন অব্দি নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করতেন শিকারি সংগ্রাহকদের জীবন করুণাযোগ্য কারণ সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও তারা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারত না। কিন্তু আজ আমরা জানি যে শিকারি সংগ্রাহকরা আমাদের চেয়ে কম পরিশ্রম করে। খাবার জোগাড়ের জন্য তারা একটানা পরিশ্রম করে না। কিছুক্ষণ কাজ করার পর কিছুটা আরাম বিশ্রাম, তারপর আবার কিছুক্ষণ কাজ এইভাবে তারা কাজের ফাঁকে পর্যাপ্ত আরাম বিশ্রামের বন্দোবস্ত করত। অন্য সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় এই সমাজে মানুষ অনেক বেশি সময় ঘুমোতে পারত। বর্তমান কাল অব্দি টিকে থাকা শিকারি সংগ্রাহকদের অধ্যয়ন করে এই নতুন ধারণার যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

1960 সালে অস্ট্রেলিয়াতে 2টি শিকারি সংগ্রাহক গোষ্ঠীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিধিবদ্ধ অধ্যয়ন করলেন ম্যাক্কার্থি এবং ম্যাক আর্থার। প্রথম গোষ্ঠীটিকে চোদ্দোদিন পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা গেল, গড়ে পুরুষরা দৈনিক প্রায় চার ঘন্টা এবং মহিলারা পৌনে তিন ঘন্টা পরিশ্রম করে। অন্য একটি পর্যবেক্ষণে গড় শ্রমের সময় দৈনিক পাঁচঘন্টা ছিল। এখানে 'কাজ' বলতে শিকার করা, কোটা, পেষা, রান্না করা, হাতিয়ার তৈরি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই ধরা হয়েছে। এই অধ্যয়ন থেকে এটা স্পষ্ট যে, এদের বেশি পরিশ্রম করতেই হয় না এবং লাগাতার পরিশ্রমও করতে হয় না। একটু সময় কাজ করলেই এরা এত খাবার জোগাড় করতে পারে যে, তারপর অনেকক্ষণ তাদের কাজ করার প্রয়োজন হয় না। এই অধ্যয়ন থেকে আরো একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে। তাহলো এই যে, আহরণকারীরা উপস্থিত সঞ্চয়ের সম্ভাবনাগুলিকে পুরোপুরি ব্যবহার করে না। ম্যাক আর্থার বলেন, 'শিকারি গোষ্ঠীটি একদিনে যত খাবার জোগাড় করে তার চেয়ে অনেক বেশি তারা জোগাড় করতে পারত। মহিলারা প্রায় প্রতিদিন সংগ্রহের কাজে বেরত কিন্তু

তারা বারবার বিশ্রাম করার জন্য বসে পড়ত। আরাম করত। এবং সারাদিন সংগ্রহের কাজ করত না। পুরুষরা একদিন শিকার পেলে দ্বিতীয়দিন আরাম করত।' তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার করত তো বটেই, তাদের খাদ্য-তালিকাও ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এতদিন আমাদের ধারণা ছিল এদের হাতে কোনো উদ্বৃত্ত সময় থাকত না, যখন তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বিকশিত করবে। এই অধ্যয়ন থেকে অবশেষে আমরা একথাও বুঝতে পারলাম যে, তাদের হাতে প্রচুর অবসর সময় থাকত।

কিছুটা এরকম অভিজ্ঞতাই হয়েছে রিচার্ড লি-র কালাহাড়ি মরুভূমির ট্কুংগদের অধ্যয়ন করে। লি বলেছেন, এই গোষ্ঠীর বাচ্চা-আদি পঁয়ত্রিশ শতাংশ লোক কোনো কাজই করে না, এবং পঁয়ষট্টি শতাংশ লোক শুধু ছত্রিশ শতাংশ দিন কাজ করে। একদিন কাজ মানে মোটামুটি ছ-সাত ঘন্টা কাজ। অর্থাৎ প্রত্যেক বয়স্ক সপ্তাহে পনেরো ঘন্টা কাজ করে নিজের এবং মোটামুটি আরো একজনের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করে। লি কি বলছেন দেখুন, 'একজন মহিলা একদিনে নিজের পরিবারের জন্য তিনদিনের খাবার সংগ্রহ করতে পারে। বাকি সময় সে নিজের ডেরায় আরাম করে, সেলাইফোঁড়াই সূচীকর্ম করে, অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে যায়, আতিথেয়তা আত্মীয়তা করে। রোজ কাঠকুটো এনে রান্নাবান্নার কাজ সারতে তাদের দু-তিন ঘন্টা লাগে। এইভাবে রোজ একটু কাজ, বাকি আরামের দিন চর্চা তাদের বছরভর জীবনভর চলতে থাকে। পুরুষদের পরম্পরা একটু আলাদা—তারা এক সপ্তাহ ধরে শিকার করে, তারপর বাকি দু-তিন সপ্তাহ আর শিকারে যায় না। তাদের কাছে শিকার ভাগ্যের ব্যাপার। যদি মনে হয় ভাগ্যে শিকার নেই তাহলে কয়েকমাস তারা শিকারে যায় না, সেই সময়ে তাদের কাজ আতিথেয়তা আত্মীয়তা ও নাচগান।'

লি বলেন, এখানকার লোকের রোজ খাদ্যের প্রয়োজন 1975 ক্যালরি, কিন্তু তাদের দৈনিক উৎপাদন 2140 ক্যালরি। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাদ্য তাদের কাছে থাকে। যখন এদের জিজ্ঞাসা করা হলো তারা চাষাবাদ কেন করে না—তারা বলল,' আমরা কষ্ট করে ফসল কেন ফলাব যখন দুনিয়ায় এত মোঙ্গোঙ্গো বাদাম পড়ে রয়েছে।' প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে, নারকোলের মতন মোঙ্গোঙ্গো বাদাম এমন একটি খাদ্য যার মধ্যে বহুরকম পুষ্টিগুণ রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহকারী সমাজের ছবি মোটামুটি একই রকম—*তাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই কিছু কারণ রয়েছে যার জন্য তারা সামান্য পরিশ্রম করেই নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারে।*

যদি আমরা একথাটা বুঝতে পারি যে, আহরণকারীরা প্রকৃতির প্রাচুর্যের ওপর ভরসা করে মানুষের উৎপাদন কৌশলের দুর্বলতা নিয়ে কান্নাকাটি করে না, তাহলে আমরা তাদের অন্যান্য বিচিত্র আচরণগুলিও বুঝতে পারব।

দেখা গেছে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় এরা একদমই তাড়াহুড়ো করে না। আরাম করে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন জায়গায় থেমে থেমে, রয়ে বসে চলতে থাকে। অবশ্যই তারা খাদ্যের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। কিন্তু তারা জানে, খাবার পালিয়ে যাবে না। তাই বনভোজনের মানসিকতা নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়।

দেখা গেছে, আহরণকারীরা ভবিষ্যতের জন্য কোনো পরিকল্পনা করে না। আজ যতখানি খাবার পাওয়া গেল তার পুরোটাই তারা খেয়ে নেয়। তারা অসময়ের জন্য কোনো খাদ্যসঞ্চয় করে না। এরা অবশ্যই জানে, খাদ্যসঞ্চয় করে রাখা যায় কিন্তু করে না। হয়তো তার অন্যতম কারণ এই যে, সেরকম করলে এক জায়গাতেই দিনের পর দিন থাকতে তারা বাধ্য হবে। এবং সেক্ষেত্রে খাদ্য-সংগ্রহের এলাকাটি অতি দোহনে রিক্ত হবে। সেখানকার প্রাচুর্য নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে ভালো হবে যদি তারা অন্যত্র চলে যায়।

দ্বিতীয়ত সংগ্রাহক সমাজের পরম্পরায় মিলেমিশে ভাগ করে খাওয়াটাই দস্তুর। এরকম না করলে সে হেয় হয়ে যায়। ভাগ করে খাওয়াই যেখানে আনন্দ এবং গৌরবের সেখানে তারা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ভাণ্ডার বানাবে কেন? অর্থাৎ সুযোগ সম্ভাবনার দিক থেকে সঞ্চয় করা সম্ভব হলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে তা অযৌক্তিক এবং সামাজিক দৃষ্টিতে সম্ভবই নয়।

একটি জায়গায় প্রথমে পর্যাপ্ত আহার্য পাওয়া গেলেও কিছুদিন পর সেখানকার আহার্য কমে আসতে বাধ্য। এই অবস্থায় সাধারণ বুদ্ধি বলবে যে, তাদের অন্যত্র চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ চলমান থাকলেই তারা প্রকৃতির প্রাচুর্যকে টিকিয়ে রাখতে পারবে। এ থেকে অন্য অনেক ব্যাপারও ঠিক হয়ে যায়। প্রথমত, তারা নিজেদের কাছে যথাসম্ভব কম জিনিস রাখবে যাতে যাত্রা সহজ হয়, দ্বিতীয়ত দলে চলচ্ছক্তিহীন লোক শিশু বৃদ্ধ ইত্যাদি যথাসম্ভব কম রাখতে হয়। অনেক সময় এরকম মানুষকে মৃত্যুর মুখে ছেড়েও যেতে হয়।

প্রত্যেক সমাজেই প্রয়োজন এবং সীমাবদ্ধতা অনুসারে জনসংখ্যা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নানাভাবে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে সেই সংখ্যা। সংগ্রাহকরা যেহেতু প্রকৃতির ওপরই নির্ভরশীল তাই প্রকৃতিকে কতখানি দোহন করা যাবে তাই দিয়েই ব্যাপারটা নির্ধারিত হওয়াটাই প্রত্যাশিত। এবং

এরই মধ্য দিয়ে তাদের জীবনযাপনের প্রথা প্রকরণও নির্ধারিত হওয়াও স্বাভাবিক—যেমন, জনসংখ্যা সীমিত রাখা বা ভ্রাম্যমাণ জীবনের জন্য প্রস্তুত থাকা। এই জন্য শিকারি সংগ্রাহকদের মধ্যে বাচ্চাকে বহুবছর ধরে মায়ের দুধ খাওয়ানো, সেই সময় যৌন-সংসর্গ না করা, শিশু-হত্যা, ইত্যাদি নানা-প্রথা দেখা যায়।

উপসংহার

যুগের পরিবর্তনের সাথে যে অর্থব্যবস্থার জন্ম হয়েছে তার মধ্যে নানান স্ববিরোধিতা রয়েছে। যার ফলে সমাজ একই সাথে বিত্তবান এবং বিপন্ন দুই-ই হয়। প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উৎপাদন বেড়েছে। পরিবেশের ওপর মানুষের আপাত নিয়ন্ত্রণও বেড়েছে এবং এর থেকে এক ধরণের স্থায়িত্ব এসেছে। আবার এরই সাথে এমন সামাজিক কাঠামো তৈরি হয়েছে যেখানে কিছু লোক ধনী আর অধিকাংশ লোক দরিদ্র হয়ে পড়েছে। ভালোভাবে বেঁচে থাকতে গেলে ন্যূনতম যা প্রয়োজন সেই খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান এমন কি দূষণ-মুক্ত পরিবেশ থেকেও বহুমানুষ আজ বঞ্চিত। আহরণকারীদের উৎপাদন কৌশল উন্নত ছিল না। পণ্যসামগ্রীও তাদের কম ছিল কিন্তু তারা এমন দরিদ্র ছিল না হয়তো। জিনিসপত্রের পরিমাণের সাথে, পণ্যের প্রাচুর্যের সাথে দারিদ্রের কোনো সম্পর্ক নেই। দারিদ্র হলো মানুষের সাথে মানুষের বিশেষ ধরণের সম্পর্ক। এটা সভ্যতারই সৃষ্টি।

□ লেখাটি প্রস্তুত করায় বেশ কয়েকজন বন্ধু সহায়তা করেছেন। লিপিবদ্ধ করার কাজ করেছেন বলাই।

বই মেলায় পাওয়া যাচ্ছে
নাগরিক মঞ্চ প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা

বিপন্ন পরিবেশ

স্টল নং ৩২৫

যোগাযোগ

134, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,
ব্লক-বি, রুম-7 (দোতলা)
কলকাতা 700 085

পড়ুন

FRONTIER

61 Mott Lane, Calcutta 700 013

Annual Subscription Rs. 140.00

Send money by M.O./Bank draft.

লেখা পাঠান

বিওবি-র জন্য লেখা পাঠান। আপনি লিখুন অথবা আপনার পরিচিতজনকে লিখতে অনুরোধ করুন। সমাজ, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, অধিকার, মতাদর্শ ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে লেখা পাঠাতে পারেন। এছাড়া মতামত, সমীক্ষা-রিপোর্ট বা উল্লেখযোগ্য বইয়ের পরিচিতিও পাঠাতে পারেন।

Monthly Magazine

COMMUNALISM COMBAT

Subsidised Annual Subscription
Rs. 72.00

Send money by M.O./Bank draft.

Communication & Publishing Pvt. Ltd.
Post. Box No. 28253,
P.O. Juhu □ Mumbai 400 049

স্মরণ

প্রিয় পরিমলদা স্মরণে

শ্রী পরিমল ভট্টাচার্য, আমাদের সবার পরিমলদা, গত 27 ডিসেম্বর, 1999, আশি বছর বয়েসে দমদমের লালগড় কলোনিতে তাঁর নিজের বাড়িতে মারা গেলেন। তাঁর যকৃতে ক্যান্সার হয়েছিল। দুঃসহ দারিদ্র্য, বারে বারে কারাবাস, রাজনৈতিক শত্রুতা-কন্টকিত তাঁর দীর্ঘজীবনের সঙ্গিনী স্ত্রী সুধা ভট্টাচার্য, আমাদের বৌদি মারা যান তাঁর মৃত্যুর প্রায় আট মাস আগে। এই শোক তাঁর বুকে যে গভীরভাবে বেজেছিল সেটা তাঁর কথাবার্তা থেকেই বোঝা যেত।

তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর অঞ্চলের মানুষ স্থানীয় একটি স্কুলে এক শোকসভায় মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে একের পর এক যাঁরা তাঁকে স্মরণ করে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে কথা বললেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আজকের বহুভাগে বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও আরও অন্য 'বামপন্থী' দলের প্রবীণ সদস্য যাঁরা বয়সের দিক থেকে পরিমলদারই কাছাকাছি ও প্রাক্তন রাজনৈতিক সহকর্মী। 1967তে নকশালবাড়িতে কৃষক বিদ্রোহ ঘটার কিছুদিন পর থেকে অবশ্য সেই সহকর্মীর সম্পর্ক তাঁদের সাথে আর তাঁর ছিল না। তবুও তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তাঁরা এসেছিলেন।

এরও এক সপ্তাহ পরে আমদেরই এক বন্ধুর বাড়িতে ঘরোয়াভাবে আর একদল মানুষ তাঁকে স্মরণ করার জন্য মিলিত হন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে বড় এমন অল্প কয়েকজন ছিলেন যাঁদের সাথে একজন অগ্রজ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পরিমলদার পরিচয় হয় ষাটের দশকের গোড়া থেকে শুরু করে সত্তর দশকের গোড়া পর্যন্ত। এই সময়টাতেই পরিমলদা প্রথমে সি পি এম এর মধ্যে ও পরে সি পি এম থেকে বেরিয়ে আসা 'নকশালপন্থী' শিবিরের মধ্যেও 'মতাদর্শগত' সংগ্রামে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য ঐ 'মতাদর্শগত' সখ্যতার বিশেষ কোনো প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। কিন্তু যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই ঘরোয়া জমায়েতে হাজির অধিকাংশই ছিলেন বয়সে আরও অনেক তরুণ, প্রায় তাঁর সন্তানের সমতুল্য। আশি বা নব্বই দশকে এই তরুণদের সাথে তাঁর পরিচয়, যেখানে 'মতাদর্শে'র কোনো ভূমিকা ছিল না। এঁদের কাছে পরিমলদা ছিলেন একজন পরমপ্রিয় বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু। নিজের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া (ভাই, বোন, সন্তান ইত্যাদি) এদের সাথেই পরিমলদার সম্পর্ক শেষ দশ পনেরো বছরে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল।

এই দুই জায়গায় পরিমলদাকে যাঁরা স্মরণ করেছিলেন তাঁদের পরিচয় থেকেই পরিমলদার দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন পর্বের একটা আলগা রূপরেখা পাওয়া যায়। এর সাথে আর একটু যোগ করা যেতে পারে যে তাঁর জন্ম হয়েছিল ব্রিটিশ আমলের অবিভক্ত বাংলা ও বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়। তাঁর বাবা ছিলেন তালুকদার অর্থাৎ জমি, প্রজা, এসব নিয়েই ছিল তাঁর কারবার। পরিমলদার স্কুলের লেখাপড়া বেশিদূর এগোয় নি। অল্প বয়সে ময়মনসিংহ জেলাতেই এক পাটকলে মজদুর হিসেবে তিনি যোগ দেন। সেখানে থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত আন্দোলনের সাথে প্রায় জীবনব্যাপী অংশীদারত্বের সূত্রপাত। পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা ও তারই উপকণ্ঠে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে, অর্থাৎ জনস্বার্থে তাঁর সমগ্র জীবন নিবেদিত হলেও তাঁর চরিত্রের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমতা, চক্র, চক্রান্ত এসবের ধারে কাছে তিনি থাকতে পারতেন না। কাজেই বহু মানুষের, এমনকী তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের শ্রদ্ধাভাজন হলেও প্রচলিত অর্থে নেতা তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। পরিমলদার মতো মানুষদের জীবন এক অর্থে একের পর এক স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। কিন্তু তাতে তাঁর জীবনপ্রেমে ভাঁটা পড়ে নি। তিনি অনেক সময়েই বলতেন যে, তিনি 'দেড়শ বছর' বাঁচতে চান, যাতে সব 'রগড়' দেখে যেতে পারেন। চারপাশের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের বহু ফাঁক, ফাঁকি, ধর্মান্ধতা এই তীক্ষ্ণধী মানুষটির চোখ এড়াত না। আর অনবদ্য রসাল ভাষা ও ভঙ্গিতে তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতেন। যেমন, কোনো এক উপলক্ষ্যে তাঁর চারপাশের 'নেতাদের' কাউকে কাউকে তিনি একবার বলেছিলেন, 'লোকেদের মধ্যে ঝগড়া লাগলে তো আপনাদের মজা, ঝগড়া মেটাবেন যাতে মরে গেলে লোকে ফটোতে মালা দেয়। আমি মরলে আমার এক ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে বাগজোলার খালে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যাব।' বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর একবার ভিড় বাসে উঠতে না পেরে তিনি পাদানিতে দাঁড়ানো যাত্রীদের লক্ষ্য করে দুহাত তুলে চিৎকার করে বলেছিলেন 'আমি হিন্দু, হিন্দু! হিন্দুকে সাহায্য করছেন না আপনারা।' পুলিশ লকআপের ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তিনি লকআপবাবুর সাথে রসিকতা করতে পারতেন। পরিচিতজনদের জন্য মমতায় ভরা ছিল তাঁর মন। তাঁর ঘরোয়া স্মৃতি-বাসরে তাঁর ছেলে মেয়ে নাতনি ও অন্যান্যদের কাছ থেকে তাঁকে ঘিরে গভীর মানবিকতা বোধ সম্পৃক্ত এমন আরও অসংখ্য কাহিনী অবিরল ধারাস্রোতে কয়েকঘন্টা ধরে বয়ে চলেছিল। সারা জীবন জনস্বার্থে নিবেদিত এই জীবনপ্রেমী বয়োজ্যেষ্ঠ সখার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা *বিওবি*-র তরফ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করি। তাঁর সন্তান, ভাই বোন সবাইকেই জানাতে চাই যে, তাঁদের স্মৃতি ও শোকের আমরাও অংশীদার।

অন্য চিকিৎসা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

আমার পিসিমার চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল আমার। কলকাতার একটা নামীদামী নার্সিংহোমে অচিকিৎসায় ভুলচিকিৎসায় অযত্নে অবহেলায় ব্যাবসায়িক লোভে আমার পিসিমা মারা যায়। আমার সেই অভিজ্ঞতা এবং এখনকার চিকিৎসার ধরণ নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-তেই।* বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-র বন্ধুরা একসঙ্গে বসে রোগীদের অধিকার নামে একটা প্রস্তাবনা বানিয়েছিলাম।* বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-তে ছাপা হয়েছিল। নানা জায়গায় আলোচিত হয়েছিল। এখনও সুযোগ পেলে আলোচনা করি। চিকিৎসা নিয়ে স্বাস্থ্য নিয়ে আমার ভাবনাচিন্তা তখন থেকে শুরু। পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর অবস্থা নিয়ে একটা ছোট পুস্তিকা বানিয়েছি। কয়েকজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে পশ্চিম বাংলারই একটা গ্রামে, গ্রামের মানুষের চিকিৎসা নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে টুকরোটাকরা কাজে যুক্ত হয়ে আছি। পরীক্ষানিরীক্ষা করছি। সময় হলে লিখব। এইরকমই আরেকটা অভিজ্ঞতা আর ভাবনা নিয়ে এই লেখা।*

আমার মার অসুখ হলো। অসুখ বাড়ল। ডাক্তাররা বললেন হাসপাতালে নিয়ে যেতে। নিয়ে যাওয়া হলো। নানা পরীক্ষা করা হলো। চিকিৎসা করা হলো। মা একটু ভালো হয়ে উঠল। আমরা মাকে বাড়ি নিয়ে এলাম।

আমার দুই ডাক্তার বন্ধু অনুপ আর রীনা মার চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মার যে সমস্ত পরীক্ষা হয়েছিল তার রিপোর্ট দেখে ওরা জানাল মার এমন অসুখ করেছে যে, মা বেশিদিন বাঁচবে না। ওষুধ আছে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই ওষুধ বেশিদিন কাজ করবে না। এখন নানা কষ্ট, কষ্টের উপসর্গ দেখা দেবে। শরীর ভালো খারাপের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। এই ভালো এই খারাপ এই রকম। বড় ডাক্তারবাবু যিনি মাকে হাসপাতালে দেখেছিলেন তার সঙ্গে কথা হলো একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর, ধরা যাক মাসে একবার, মাকে দেখে যাবেন। পাড়ায় একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। রাতবিরেতে দরকার পড়লে যাতে আসেন। এ তো হলো সাধারণত যা করা হয় তাই।

সাধারণত যা করা হয় না তাও করা হলো। অনুপ আর রীনা, আমার ডাক্তার বন্ধুরা আমাদের, আমার দাদা বৌদি দিদিদের বুঝিয়ে বলল মার কি অসুখ হয়েছে। মার কি কি কষ্ট হবে। হতে পারে। কোন্ কষ্ট কতটা কমানো যাবে, যেতে পারে। কোন্ ওষুধের কি কাজ। কতটা কাজ করতে পারে। কতদিন করতে পারে। কতদিন দেওয়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে কোন্ পরীক্ষা করে কি জেনে নিতে হবে। কি জানা যাবে। আমরা জানলাম, বুঝলাম, চেষ্টা করলাম জানার বোঝার।

মা থাকত মেজদা মেজবৌদির কাছে। মেজবৌদি দায়িত্ব নিল। একজন সেবিকা এলেন সবসময়ের জন্য। অনুপ এদের দুজনকে বুঝিয়ে দিল, বুঝিয়ে দিত, দেখিয়ে দিত কিভাবে কি করতে হবে। স্নান করানো, খাওয়ানো, কি খাওয়া, কতটা খাওয়া, কখন খাওয়া, কিভাবে শোওয়ানো, বসানো, হাঁটানো, কি ব্যায়াম, কিভাবে করানো। আমরাও শিখলাম।

ভাইবোনরা পালা করে মার কাছে আসা, বসা, কথা বলা, গায়ে মাথায় হাত বোলানো, আরাম দেওয়া। মেজবৌদির কাজে সাহায্য করা, ছুটি দেওয়া, বিশ্রাম দেওয়া। প্রতিবেশীরাও আসা যাওয়া করতেন। মাকে রোজ স্নান করানো হতো, ধোওয়া কাপড় পরানো, পাউডার দেওয়া, তেল লাগানো, খাবার দেওয়া, ওষুধ খাওয়ানো, বসানো, হাঁটানো, নিয়ম করে চলল। সঙ্গে মার পাশে বসা, গায়ে মাথায় হাত বোলানো, বিকেলে মাকে বসিয়ে মার সামনে বসে ভাইবোনদের গল্প চলল।

অনুপ একটা সময় অন্তর আসত। মার শরীর নিয়ে শরীরের কষ্ট নিয়ে মেজবৌদি বলে যেত। আমরা ভাইরা পাশ থেকে টুকটাক যোগ করতাম। অনুপ বুঝিয়ে দিত কোন্ কষ্টের উপসর্গ কেন। এটা কতটা কমানো যাবে, কতটা যাবে না। কোন্ ওষুধটা বাদ দিতে হবে, কোন্ ওষুধটা কমাতে হবে, কোন্ ওষুধটা বাড়াতে হবে। কোন্ ওষুধটা যোগ করতে হবে। কোন্ ওষুধের কি কাজ, কতটা কাজ, ওষুধ ছাড়া কোন্ খাবার কতটা দিতে হবে। মাকে কি কি করাতে হবে।

'বেড শোর' কাকে বলে আমরা জানতাম না। বৌদি দেখাতে

অনুপ বলল, আমরা চিনলাম। এর জন্য কি করতে হবে বলল। সেই 'বেড শোর' সারিয়ে দেওয়া হলো এবং আর কখনও হয় নি। মার মানসিক দিকটা দেখত রীনা, একইরকমভাবে বুঝিয়ে বলত, আমাদের কি করার।

মার অসুখ মার চিকিৎসা মার যত্ন-সেবা তখন আমদের পারিবারিক বিষয়।

আস্তে আস্তে মার অসুখ আরও খারাপ হতে লাগল। মার প্রতি নজর আরও বাড়িয়ে দেওয়া হলো। সবসময় খেয়াল রাখা হতো মা যেন ভেজা অবস্থায় একটুও না শুয়ে থাকে। আমরা পদ্ধতি বের করলাম মার শরীর কত কম ভেজে।

মার অসুখ একটা করে খারাপ স্তরে পৌঁছচ্ছে অনুপ আর রীনা আমাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করাচ্ছে।

মা একদিন ভোরবেলা হঠাৎই মারা গেলেন। আমাদের প্রত্যাশা থাকলেও, অপ্রত্যাশিতভাবে। সাংঘাতিক কোনো কষ্টের মধ্যে দিয়ে নয়, অন্তত বাহ্যিকভাবে। মাকে সেবা-যত্নের মধ্যে দিয়ে চিকিৎসা করার আমাদের সবার কাজ শেষ হলো।

মার মৃত্যুতে আমাদের শোকের মধ্যে একটা সান্ত্বনা রইল, মার কষ্টের মধ্যে আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব মাকে আরাম দেবার চেষ্টা করেছি।

পিসিমার চিকিৎসার অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলাম, মাকে যদি হাসপাতালে নার্সিং-হোমে রাখতাম, যা যে কোনো ডাক্তারই রাখতে বলত, মা অযত্নে অবহেলায় অচিকিৎসায় ভুল চিকিৎসায় কষ্টে অনেক আগেই মারা যেত। ব্যাবসায়িক কারণে মাকে কষ্ট দিয়ে নানা সব পরীক্ষাটরিক্ষা করিয়ে নিত।

অন্যদিকে মা নিজের ঘরে চেনালোকেদের কাছে আদর যত্নে সেবায় ঠিকঠাক চিকিৎসায় থেকে স্বাভাবিকভাবে চলে গেলেন। আজকের এই একা একা হয়ে যাওয়া হয়ে থাকার সময় আমরা অনেকে মিলে মার চিকিৎসায় সেবায় থাকলাম নিজের নিজের দায়িত্ব জেনে নিয়ে বুঝে নিয়ে।

আমার এই ধারণা একদিন কথায় কথায় আমার বন্ধু অমল, অমল সোম, যে রোগীদের ভালো রাখার নানা কাজকর্মে ভাবনাচিন্তায় রয়েছে, তাকে বললাম। অমল বলল এটা একটা বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারণা। ওনিয়ে লেখা আছে ইংরাজিতে। আমাকে পড়তে দিল। পড়লাম আর মার চিকিৎসার সেবার অভিজ্ঞতাটা মেলালাম। কয়েকটা কথা বলতে ইচ্ছ করছে। বলছি।

কোনো একটা সময় জানা যায় কোনো একটা অসুখ সারবে না। চিকিৎসায় ওষুধে সারবে না। তখন মৃত্যুকে স্বাভাবিক স্তর বলে মেনে নেওয়া। তখন রোগীকে শুধু কষ্ট থেকে আরাম দেওয়া, শান্তি দেওয়া। তখন তাকে আন্তরিক যত্ন করা, জীবনযাপনটা আরামদায়ক করা। শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে। সামাজিকভাবে। তখন নৈর্ব্যক্তিক, প্রাতিষ্ঠানিক, প্রযুক্তি নির্ভর, ওষুধ-ভিত্তিক চিকিৎসা কাঠামোয় না ঢুকে পড়া। সেখানে রোগী একটা রোগগ্রস্ত শরীর, একজন অসহায় মানুষ নয়।

তখন একটা পারিবারিক, সামাজিক, যত্ন-সেবার পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে একজন রোগীর ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট প্রয়োজন খেয়াল করা হবে। যেখানে তার শারীরিক মানসিক কষ্ট লাঘব করা হবে। যেখানে রোগী, রোগীর পরিবার, রোগীর পছন্দের মানুষ। সচেতন চিকিৎসক, সহৃদয় সেবাকর্মী সবাই মিলে মিশে একটা চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থা বানিয়ে ফেলা। যেখানে মৃত্যু শান্তিময়, সম্মানজনক।

আমার কথা বলা এখানেই শেষ। বাকি দুটো কথা।

আমার ছোটোবেলায় দেখেছি পাড়ায় কারও কোনো কঠিন অসুখ হলে, কলেরা এবং পক্সেও, মা সেবা করতে যেত। মা যত্নঅত্নর নিয়ম জানত। মাকে পাড়ার লোকেরা ডেকে নিয়ে যেত। মা গিয়ে দাঁড়ালে নিশ্চিন্ত হতো। মার কাছে আমিও কিছু শিখেছি।

আমার এই সব কথাবার্তা হয়তো অচিকিৎসা শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক অ-আধুনিক হয়ে যাচ্ছে। আমি অনুপকে, আমার যে ডাক্তর বন্ধু মার এই অন্য চিকিৎসার উদ্যোক্তা, তাকে বলেছি এ নিয়ে দুচার কথা লিখে দিতে। মার সঙ্গে অনুপের বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যায়। দুজনে দুজনের সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতা করত। অনুপ এলেই মা বলত, কি ডাক্তার কি মনে হচ্ছে পারবে? অনুপ উত্তর দিত পারছি তো।

ডাক্তার অনুপের ভাষ্য ...

মুখে বলছি পারছি। কিন্তু নিজে ভালোভাবেই জানি যে 'পারছি না'। বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজন, হাবুলদা, শুভেন্দুদা সকলেই জানেন যে আমি আসলে 'পারছি না'। আসলে হেরে যাচ্ছি।

কলকাতার নামী নার্সিং-হোমে এর আগে পিসিমা ছিলেন। পিসিমার মৃত্যুর আগের দিন অবধি কোনো ডাক্তার বলেন নি যে তাঁরা পারছেন না। সকলেই বলেছেন যে, তাঁরা ভালোই পারছেন। আমি ডাক্তার(বাবু)দের দোষ দিই না। তাঁরা কখনই বলতে পারেন না যে, তাঁরা পারছেন না। অন্তত চিকিৎসাশাস্ত্রকে ঘিরে আমাদের এখানে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেই সংস্কৃতির আবহাওয়ায় তো কখনই নয়। আমরাও তো ভালো ডাক্তার খারাপ ডাক্তারের হিসেব কষি তাঁর সাফল্য দিয়ে। চিকিৎসাশাস্ত্রে অসফলতার কোনো স্থান নেই। কারণ চিকিৎসা মানেই তো

এক অবস্থা মেনে অন্য অবস্থায় যাওয়া—খারাপ অবস্থায় না থেকে কিছু বা সম্পূর্ণ ভালো অবস্থায় যাওয়া। এক কথায় *অবস্থার পরিবর্তন* (Change of State)। যে ডাক্তার অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারেন না, তিনি কেমন ডাক্তার? যিনি বিশ্বকাপ জেতাতে পারেন না, তিনি কেমন অধিনায়ক? যিনি যুদ্ধে জিততে পারেন না, তিনি কেমন সেনানায়ক?

আলোচনাটা একটি বিশেষ ব্যক্তি (ডাক্তার/রোগী), একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান (নার্সিং-হোম/ হাসপাতাল/ক্লিনিক), একটি বিশেষ স্থান বা সময় ধরে হতে পারে। অর্থাৎ চিকিৎসাবিজ্ঞান যাঁরা প্রয়োগ করেন বা যেখানে করেন সেই বিশেষ প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ ধরে হতে পারে, আবার চিকিৎসাবিজ্ঞান ধরেও হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের 'বিজ্ঞান'টুকু ধরে হতে পারে। বিজ্ঞানের চারপাশ ঘিরে যে 'জ্ঞান'-এর সামগ্রিক পরিমণ্ডল তাকে ঘিরেও হতে পারে। অর্থাৎ আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি *কনটেক্সট* ধরে নয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের *'টেক্সট'* ধরে। প্রয়োগের জায়গা বা প্রয়োগকারীকে ধরে নয়, প্রয়োগের বিষয়বস্তু ধরে।

কি আছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের 'টেক্সট' এ?

আছে এক শরীরের ধারণা। শরীরের এই ধারণা একদিনে তৈরি হয় নি। ধীরে ধীরে এর উদ্ভব হয়েছে। এক সময় আমরা শরীর বলতে বুঝতাম বায়ু, পিত্ত, কফ। বুঝতাম 'নাড়ী দেখা'। হয়তো বুঝতাম আরও অনেক কিছু। বিশেষ সমাজ ও গোষ্ঠীর ছিল আলাদা শরীর, আলাদা শরীরের ধারণা, আলাদা চিকিৎসাব্যবস্থা। এই ধারণায় শরীর অনেক সময়ই তার মূর্ত শারীরিকতাকে উপচে চলে যেত তার আশপাশের পরিবেশে, জল, হাওয়ায়, বাসস্থানে, এমনকি তা সম্পর্কিত হয়ে থাকত গোষ্ঠীর টোটেম-এর সাথেও। শরীরের কোনো *একটি* ধারণা সম্ভবত ছিল না। ছিল না শারীরকে ব্যক্ত করার ব্যাখ্যা করার কোনো *একটি* নির্দিষ্ট রূপক। শরীরকে জানার, বোঝার পদ্ধতি তখন অনেকান্ত।

পশ্চিমী বিজ্ঞানের হাত ধরে এল এক সামগ্রিক শরীরের ধারণা। এক বিশ্বজনীন শরীর। এই শরীর আঠারো ও উনিশ শতকের শরীরের ধারণা। এক কথায় বললে, এই শরীর উনিশ শতকের উদ্ভূত 'অ্যানাটোমোক্লিনিকাল মেডিসিনের' শরীর।

আঠারো শতকের আগে ইওরোপে অসুস্থ মানুষকে ডাক্তার তার ক্লিনিকে অনেকগুলি প্রশ্ন করতেন। তার মধ্যে একটি জরুরি প্রশ্ন —*আপনার কী হয়েছে?* অসুস্থ মানুষটি দিয়ে যেতেন তার অসুস্থতার ধারাবিবরণী, সময় ধরে ধরে। কখন কোন্ উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং কি আকারে। ডাক্তার উপসর্গের কি কি বর্গীকরণ করে অসুখকে চিনতে চেষ্টা করতেন।

আঠারো শতকের শেষদিকে এই প্রশ্নের ধারা পালটে গিয়ে হলো-*আপনার কোথায় ব্যথা?* এই '*কোথায়*' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। এবার আর চিকিৎসক অসুখের ধারাবিবরণী চাইছেন না বা সামান্যই চাইছেন। অনেক বেশি করে জানতে চাইছেন অসুখ কোথায় হয়েছে। অর্থাৎ এবার সময় ধরে ইতিহাস নয়। এবার তিনি খুঁজছেন একটি বিশেষ 'স্পেস', যে 'স্পেস' বা স্থানে অসুখটিকে চিহ্নিত করা যাবে।

উনিশ শতকের আগে আমরা অসুখের অর্থাৎ ঘটনার বর্গীকরণ করতাম সময় ধরে ধরে। উনিশ শতকে এই সময়ের ধারণার সাথে যুক্ত হলো একটি 'স্পেস'-এর ধারণা। আমরা অসুখটিকে চিহ্নিত করতে চাইলাম এক বিশেষ স্থানিকতায়। শব ব্যবচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে যে 'স্থান' বা 'স্পেস'-কে প্রত্যক্ষ করা যায়, তার 'অ্যানাটমিকে' জানা যায়, যে 'স্পেসের' পরিবর্তনকে লিপিবদ্ধ করা যায়। অসুখ মানে এবার থেকে আর সম্পূর্ণ মানুষটির দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সম্বলিত সমগ্র সত্তা নয়। অসুখ মানে এবার এক বিশেষ 'স্পেস'—যে স্পেসের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনই চিকিৎসকের কাজ।

উনিশ শতকে মেডিসিনের দেখার দৃষ্টিতে এল এক আমূল পরিবর্তন। শরীর এখন খণ্ড খণ্ড অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমাহার। সবকটি *খণ্ডকে* জুড়ে দিলেই যেন আমরা পেয়ে যাব *সমগ্র* শরীর। ইংরেজ শাসিত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে আমরাও পেলাম এই শরীরের ধারণা। ধীরে ধীরে শরীরের এই 'অ্যানাটোমিক্যাল' ধারণাই আমরা গ্রহণ করলাম। কিভাবে গ্রহণ করলাম কেন করলাম কতটা করলাম, সে এক অন্য ইতিহাস। পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞান কিভাবে আমাদের ধারণার জগৎকে নির্মাণ করল, আমরাই-বা কতটা পশ্চিমকে নির্মাণ করলাম। শরীরের দুটি ভিন্ন ধারণা কিভাবে একে অপরকে ধারণ ও নির্ধারণ করল, এই ধারণ নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় কিভাবে থেকে যাচ্ছে এক *'অসম বিনিময়'* (unequal exchange) সে-আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু বলা যায় প্রভু চলে গেল সাতচল্লিশের পনেরোই অগস্ট। কিন্তু আমাদের জন্য ছেড়ে গেল 'অ্যানাটোমাক্লিনিকাল' শরীরের প্রভুত্বকারী বাচন।

কলকাতার নামী নার্সিং-হোমে পিসিমা তাই আর পিসিমা নন। তিনি পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা নন। তিনি একটি 'ডায়াগোনোসিস'। যে 'ডায়াগোনোসিস' পিসিমার ফাইলের ওপরে লেখা থাকে। 'ডায়াগোনোসিস' মানে তো একটি বিশেষ অসুখ। বিশেষ অসুখ মানে তো এক বিশেষ 'স্পেস'। যে 'স্পেস'-কে ঘিরে চিকিৎসকের চিন্তা, মাথাব্যথা। আস্তে আস্তে সমগ্র মানুষটিকে আমরা ভুলে যাচ্ছি; পিসিমা আর মানুষ নন।

তাঁর দুঃখ কষ্ট নেই। বারংবার রক্ত নিলেও তাঁর ব্যথা লাগে না। তিনি এখন শুধু একটি 'স্পেস', যে স্পেস-এর ওপর চিকিৎসকের দৃষ্টি নিবদ্ধ। চিকিৎসক সতর্ক প্রহরায় সেই 'স্পেস'-এর ভালো মন্দ বিচার করছেন। সমগ্রকে ভুলে গিয়ে আমরা মাতামাতি করছি খণ্ডকে নিয়ে। রাজার বদলে প্রতিনিধিত্ব করছে রাজার মুকুট।

রাজাকে নয়— রাজার মুকুটটিকে রক্ষা করাই চিকিৎসকের কর্তব্য। মেডিসিনের 'টেক্সট' জুড়ে ছড়িয়ে আছে 'যুদ্ধের রূপক' (Military metaphor)। আপনার দাঁত যেন সেই মুকুট। তাকে আক্রমণ করার জন্য প্রতিমুহূর্তে ছুরি শানাচ্ছে একদল জীবাণু। আপনার প্রতিরোধকে পর্যুদস্ত করে যে কোনো মুহূর্তে সীমানার এপারে এসে যেতে পারে ওপারের জীবাণু। এই অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকানোর জন্য আপনাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। ব্যবহার করতে হবে ঝাঁঝাল টুথপেস্ট, জবরদস্ত টুথব্রাশ। এতেও যদি না হয়, আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন। ডাক্তার এই আক্রমণকারী। জীবাণুদের ঠেকানোর জন্য প্রয়োগ করবেন আরও শক্তিশালী মারণাস্ত্র। বিশেষ 'অ্যান্টিব্যায়োটিক'। তাতেও না হলে আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন 'অ্যান্টিবায়োটিক'. বিশেষ বিশেষ 'স্পেস'-এ বিশেষ ধরণের যুদ্ধ। বিশেষ 'স্পেস'-এর স্বতন্ত্র অনুপ্রবেশকারী। স্বতন্ত্র তার আক্রমণের পদ্ধতি। স্বতন্ত্র তাই প্রতিরোধ ব্যবস্থাও। মেডিসিনের 'টেক্সট' জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য 'কারগিল'। চিকিৎসকের তাই পরাজিত হওয়ার কোনো উপায় নেই। তিনি পারছি না বলতে পারেন না। সবসময়ই তাকে যুদ্ধজয়ের চেষ্টা করে যেতে হবে। সীমানা সুরক্ষিত রাখতে গিয়ে দেশে আর মানুষ নাও থাকতে পারে, সমগ্র শরীর পরিণত হতে পারে ধ্বংসস্তূপে? কিন্তু তাও যুদ্ধে জেতা চাই। স্বাভাবিকতার বিশেষ সীমানার মধ্যে মানুষকে ধরে রাখতেই হবে। এই সীমানা এক 'স্ট্যাটিসটিকাল' নির্মাণ। এত থেকে এতর মধ্যে 'হিমোগ্লোবিন' থাকলে স্বাভাবিক, এত থেকে এতর মধ্যে 'ইউরিয়া' থাকলে স্বাভাবিক। এত থেকে এতর মধ্যে..... মেডিসিন জুড়ে শুধুই সীমানা। সীমানায় সতর্ক প্রহরা। এপার থেকে ওপার থেকে শুধুই গোলাবর্ষণ। সেখানে পিসিমার কোনো স্থান নেই, সেখানে পিসিমার কুঁকড়ে থাকা শরীর। ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল চোখদুটি।.......

এইভাবে মেডিসিন আমাদের ঘরে ঢোকে। শুধু মেডিসিন কেন। এইভাবেই ঘরে ঢুকে যায় আগ্রাসী বাজার। আমাদের সম্পর্কগুলোকে নির্মাণ করে।

পিসিমার বেলায় আমরা পারি নি। কিন্তু মা-র অসুস্থতার সময় আমরা এক ভিন্ন স্রোতে গা ভাসালাম। অন্তত চেষ্টা করলাম। কিছুটা হলেও। মা-কে আমরা হাসপাতালে দিলাম না। বাড়িতেই রেখে দিলাম। আমরা মেনে নিলাম, মা আর বেশিদিন বাঁচবেন না। ভালোভাবে মা-কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। আমাদের চিকিৎসার যাবতীয় চেষ্টাকে আমরা এক বিশেষ সীমানার মধ্যে রেখে দিলাম। খুব সাবধানে। খুব বেশি চিকিৎসা নয়। খুব কমও নয়। বিজ্ঞান এবং বোধকে মেলানো হলো, যাতে মা কষ্ট না পান আবার যাতে চিকিৎসাও হয়। কাজটা শক্ত। এর সঠিক মাপ আমাদের জানা নেই। ব্যক্তি বিশেষে পালটেও যাবে। তবু আমরা চেষ্টা করলাম। মা শেষদিন অবধি ছেলেমেয়েদের পাশে থেকে গেলেন। তাদের সেবা, আদর, যত্ন পেলেন।

পশ্চিমে এই ধরণের চিকিৎসার নাম 'Palliative Care'। যেসব ক্যান্সার রোগীর আর বাঁচার সম্ভাবনা নেই তাঁদেরই এই বিশেষ ধরণের চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁদের জীবনের শেষ কটি দিন, যথাসম্ভব সুন্দর ও সহনীয় করে রাখার চেষ্টা করতে থাকেন ডাক্তার, নার্স, মনোবিদ, সমাজকর্মীর একটি বিশেষ সংগঠন। রোগীকে আর হাসপাতালে না রেখে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় 'Hospice' নামের এক বিশেষ প্রতিষ্ঠানে।

পশ্চিমে এই চেষ্টা কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের জন্য তৈরি হয়েছে হাসপাতালের বাইরে 'Half-Way', 'Quarter-Way' Home; আর যে রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা নেই বেশিদিন, তাঁর জন্য 'Hospice'।

আমরাও পশ্চিমের এই মডেল অন্ধভাবে অনুসরণ করতে পারি। আবার আমাদের সমাজ সংস্কৃতি, আমাদের জ্ঞানের আমাদের শরীরের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক ভিন্ন ব্যবস্থার কথাও ভাবতে পারি। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক সংগঠন পশ্চিমের থেকে অনেক মজবুত। আমরা মাকে পিসিমাকে 'Hospice' বা 'Half-Way Home'-এ না পাঠিয়ে পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যেই দেখাশুনা করতে পারি। তাতে আমরা বাজারের আগ্রাসী ক্ষমতাকেও কিছুটা খর্ব করতে পারব। আবার কথায় কথায় প্রফেশনাল (ডাক্তার-কাউন্সেলর) বা প্রতিষ্ঠানের কাছেও ছুটতে হবে না। এইভাবে হয়তো আমরা মেডিসিনের এক ভিন্ন-সংস্কৃতির সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারব।

বিষয় : পরিবেশ

তৃতীয় পর্ব

সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন এবং গ্রহ-পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য রেখে যাওয়া আজকের মানুষের সামনে কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। মোকাবিলায়, আমরা কিভাবে কি করছি বা করার চেষ্টা করছি তা জানা এবং নিরন্তর পর্যালোচনা করা তাই অত্যন্ত জরুরি। একাজ শুধু পণ্ডিত বিশেষজ্ঞের নয়, আপামর জনসাধারণেরও। কোনো-দৃষ্টিভঙ্গিগত একপেশেমি ভুল কর্মসূচির জন্ম দিতে পারে এবং অপরিবর্তনীয় ক্ষতিও করতে পারে। সব কথা মাথায় রেখে 'বিষয় পরিবেশে'র অবতারণা। ইতিমধ্যে প্রকাশিত প্রথম দুটি পর্বের রচনা অবলম্বনে **পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ** *শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় পরিবেশ আইনগুলির পরিচিতি ও পর্যালোচনা তৃতীয় পর্বের বিষয়বস্তু। যে কেউ এ বিভাগের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। মতামত, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর খবরাখবর, টীকা সমীক্ষাদিও প্রকাশের জন্য সাদরে বিবেচিত হবে। স. ম.*

পরিবেশ আইন-কানুন : নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

[সাত]

রুখতে দূষণ পাশ করেছি জবরদস্ত আইন
একটু বেচাল হয়েছ কি লক্ষ টাকা ফাইন;
বোকার মতো পড়লে ধরা হবেই কারাবাস
একতিরিশের নয়-এর ধারা পাক্কা তেরো মাস।
আহা যা করো কি ছি বলি না তা শোনো
সমঝে-বুঝে চললে পরে ভয় নেইকো কোনো।

আইন টাইন করতেই হয় আদেশ দাদার
দুনিয়াদারির হোতা—সে গড়ফাদার।
অবশ্য নানাবিধ আছে উপকার—
অভাগারা ভাগ পায়, আসে উপহার
মন্ত্রীসান্ত্রী কতো বেকার সাকার
বাজেটে বরাত জোটে, হয় সেমিনার
বাজারেতে নাম ফাটে, বিদেশে প্রচার।

তাই বলি কেঁদো নাকে—মগজ খাটাও
অতীব সরল নীতি—দাও আর নাও।
একটু খরচ আছে সে কী আর করা
তেমনি ভাবতে পারো এধরাকে সরা।
ভালো করে খুঁজে দেখো আছে কিছু ফাঁক
তাল বুঝে নেচে নাও তেরে কেটে তাক।

ভারতীয় পরিবেশ আইন নাগরিককে তথ্য জানার এবং অভিযোগ নিয়ে আদালতে যাবার যেটুকু অধিকার দিয়েছে বলে মনে হয়, তা শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানো গোছের, ধোপে টেকে না (*বিওবি*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, 1999)। তাহলে দূষণকারীকে এই বিশেষ ধরণের অসামাজিক কাজ থেকে নিবৃত্ত করবার কি পন্থা আইন নির্দেশ করে?

বিভিন্ন পরিবেশ আইনের নির্দেশ এক্ষেত্রে বেশ স্পষ্টই, সুরও অভিন্ন : দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মতো বিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার আধিকারিকরাই শুধু এ-ব্যাপারে উদ্যোগ নেবার বা আদালতে মামলা আনার অধিকারী। পরিবেশের সুরক্ষা সংরক্ষণ উন্নয়নের ব্যাপারে জনগণের অছি তাঁরাই—আইনের বিধান সেরকমই।

এই ব্যবস্থার নিহিতার্থ এভাবেও বলা যায়। পরিবেশের মতো সংবেদনশীল এবং বৈজ্ঞানিক ও আইনী সূক্ষ্মতা-জটিলতাপূর্ণ ব্যাপারে নাগরিকদের বিচার বিবেচনার ওপর বেশি ভরসা করা ঠিক নয়। বরং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ, ফরেস্ট কনজারভেটর, ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সংস্থা ও আধিকারিক এবং তদুপরি সরকারি মন্ত্রক-দপ্তর-অফিসার এঁদের ওপর নির্ভর করেই আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

এক ॥ আইন আছে, আইনের ফাঁকও আছে

পরিবেশ আইন লঙ্ঘনকারী বা দূষণকারীকে আদালতের কাঠগোড়ায় নিয়ে যাবার এক্তিয়ার যাঁদের তাঁরা মামলা-টামলা যে করেন না এমন নয়।

এমনকি সরকারি শিল্প-সংস্থাকেও তাঁরা অভিযুক্ত করতে পারেন, করেনও। কিন্তু আইনকানুনের মধ্যেই এমন ফাঁকফোকর রয়েছে যে, সদিচ্ছা যদি-বা থাকে, এগোনোর পথ থাকে না। যেমন—

ক. জল ও বায়ু আইনে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মামলা আনতে হবে বলা হলেও, পরিবেশ আইনে আর এর সমর্থন পাওয়া যায় না। কারাবাস বা জরিমানার রকম-সকম নিয়ে বেশ কিছু শব্দ খরচ করলেও পরিবেশ আইন আদালত বা বিচারক সম্পর্কে নীরব। আবার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা সীমিত, আইনে নির্দিষ্ট পরিমাণের অনেক নীচে।

খ. জল, বায়ু, পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণী—এই পাঁচটি আইনেই অপরাধীর বিচার ও শাস্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্তের পক্ষে যদি প্রমাণ করা যায় যে, আইন লঙ্ঘনের ব্যাপারটি ঘটেছে তাদের অজান্তে বা সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও তবে আর সংশ্লিষ্ট 'অপরাধ' শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে না। এটি এমন এক সংস্থান যা আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত মনে হলেও কার্যত এটি দূষণকারী বা আইনভঙ্গকারীকে রীতিমতো প্রশ্রয় দেবারই সমতুল। একে তো দূষণ/দুর্ঘটনার মতো ব্যাপারে কোনো সংস্থা বা তার অধীন ব্যক্তি বা কর্মী/কর্মীগোষ্ঠীকে 'দায়ী' হিসেবে চিহ্নিত করা অত্যন্তই দুরূহ, তার ওপর পর্যদের নিজস্ব পরীক্ষাগার ব্যবস্থাদিও অপ্রতুল। তুলনায় অনেক অভিযুক্ত সংস্থাই টেকনিক্যাল ও আইনী ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ, কাজেই আইনের এই সংস্থানের সুযোগ নেওয়া তাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজই।

গ. সংশোধিত কারখানা আইন (1987) অনুযায়ী দুর্ঘটনা বা আইনভঙ্গের দায়ে কারখানার মালিক / সংগঠক (Occupier) বা ম্যানেজার বা উভয়েই অভিযুক্ত হতে পারেন। এবং এক্ষেত্রেও তাঁদের (খ)তে বর্ণিত রাস্তা তো খোলা আছেই, উপরন্তু আরও একটু বাড়তি সুযোগ আছে : যদি অভিযুক্তরা মনে করেন অপরাধটির জন্য অপর কোনো ব্যক্তি দায়ী এবং সেই অপর ব্যক্তিকে যদি তিনি বা তাঁরা তিনমাসের মধ্যে আদালতে হাজির করাতে পারেন, তাহলেও তাঁরা নিরপরাধ বিবেচিত হতে পারবেন। ভারতের মতো আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের দেশে, এটা কি রামের অপরাধে শ্যামকে সাজা দেবার পোক্ত ব্যবস্থা সে-কথা ভাবা অযৌক্তিক হবে?

ঘ. দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ শুধু যে আদালতে অভিযোগ আনতে পারেন তাই নয়। ক্ষেত্র বিশেষে পর্ষদ জল বা বিদ্যুৎই সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে কারখানা/কারবার পুরো বা আংশিক বন্ধ করারও আইনী ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এটিও পর্ষদ বাস্তবে বহুদিন (1988 পর্যন্ত) প্রয়োগ করতে পারে নি। কারণ জল বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের আদেশ কিভাবে কার্যকর হবে সে-ব্যাপারে আইন নীরব। পুলিশ বা জল/বিদ্যুৎ সরবরাহের দপ্তর বা নিগমের সহায়তা ছাড়া পর্ষদের পক্ষে নিজে থেকে একাজ করা সম্ভব নয়।

ঙ. কারখানা আইনভঙ্গের মামলায় আদালতের এক্তিয়ার নিয়েও বিরোধ প্রকট। কারখানা যেখানে অবস্থিত বা যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত বলার পাশাপাশিই আইন বলছে, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর (জুডিশিয়াল) ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে নিম্ন আদালতে এই আইনের অধীনে মামলা আনা যাবে না। অথচ কারখানা বা দুর্ঘটনার স্থানটি এমন কোনো এলাকায় হতেই পারে যেখানকার আদালতে (যেমন মহকুমা) প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নাও থাকতে পারেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, এই বিচারকদের সাজা দেবার (অর্থদণ্ড বা কারাবাস) ক্ষমতাও খুবই সীমিত। সেক্ষেত্রে আইনী সংস্থান (সাতবছর পর্যন্ত কারাবাস বা দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা) প্রহসনে পর্যবসিত হয়। শ্রীরামপুরের একটি কারখানার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা আনায় কারখানার তরফের দাবি মেনে হাইকোর্ট মামলাটিকে খারিজ করে দিয়ে শ্রীরামপুর মহকুমা বিচারকের আদালতে আবার শুরু করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আইনী এইসব ফাঁকফোকর ফাটলের ফল কি হতে পারে তা অনুমান করা কঠিন নয়। অবশ্য অনুমানেরই বা কি দরকার? বিগত কুড়ি বছর বা তারও বেশি সময় ধরে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলি (এবং পরিবেশ দপ্তরের বিভাগ ইত্যাদি) কাজ করছে। পর্ষদ বহু মামলা করেছে কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তেমন সুবিধে করে উঠতে পারে নি। মামলা গড়িয়েছে বছরের পর বছর. 'অপরাধ' প্রমাণ করা যায় নি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, আবার প্রমাণ হলেও সাজা হয় নি এবং তার চেয়েও বড় কথা, দূষণ/দুর্ঘটনা কমারও কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি।

এভাবে অপ্রতুল আইনকানুন এবং অদক্ষ ও দুর্বল পরিকাঠামো নিয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলি যখন নির্ধারিত ন্যূনতম দায়দায়িত্বটুকুও সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিল, তখন সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট তাদের কাছে আশীর্বাদ বয়ে আনল। শব্দদূষণ

সম্পর্কিত অসম্পূর্ণ কিছু বিধিনিয়ম ঘোষিত হয়েছিল সেই 1986 সালেই। কিন্তু এ রাজ্যে তার প্রয়োগের মহড়া সম্ভব হলো তখনই যখন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সেই বিধিনিয়ম আরও একটু পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল এবং পুলিশ-প্রশাসন-পর্যদের মধ্যে কোনোরকম একটা সমন্বয় কোর্টেরই নির্দেশে সাধিত হলো। অনুরূপভাবে, উৎপাদনস্তরেই মোটরগাড়ির গ্যাস-ধোঁয়া নির্গমনের সীমা নির্দিষ্ট করে বিধিনিয়ম ঘোষিত (1986) হলেও এবং সেগুলি 1991-92 থেকে কার্যকর হবার কথা থাকলেও, কোনো উৎপাদকই সেগুলি এতদিন মানে নি, কোনো দপ্তর বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদও সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি বা পেরে ওঠে নি। (যদিও রাস্তায় বেরোনো গাড়ির পরীক্ষার ব্যাপারে তাদের একাংশের উৎসাহে ঘাটতি ছিল না!) এখন, এই 1999-তে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ হলো যে মোটরগাড়ি প্রস্তুতকারকদের ইউরো-1 বা -2 বিধি মেনে গাড়ি উৎপাদন করতে হবে (অবশ্য এখন আবার বলা হচ্ছে ইউরোবিধি নয়, মানতে হবে ইন্ডিয়া 2000 বিধি যা প্রকৃতপক্ষে ইউরো-1 এর সঙ্গে অভিন্ন!)। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বলেই পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ এখন পুলিশ এবং জল/বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির সহায়তায় প্রয়োজনে দূষণকারী কারখানার জল/বিদ্যুৎ বন্ধ করতেও পারছে। তেমনি আদালতের শুভেচ্ছা নিয়েই অনেকক্ষেত্রে একটা আধা আদালতী (quasi-judicial) ভূমিকাও পালন করছে পর্যদ। সম্প্রতি তাদের তত্ত্বাবধানে **পাবলিক গ্রিভান্স সেল**ও খোলা হয়েছে।....... এইভাবেই কি কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ, কি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ ক্রমশ বেশি বেশি করে আদালত-নির্ভর হয়ে পড়ছে।

দুই ॥ ত্রাণ বনাম ক্ষতিপূরণ : আইনী বিভ্রান্তি

আইনী মহিমার আর এক ধরণের প্রকাশের দিকে এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক। দূষণ ও দুর্ঘটনায় সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তিহানি, পঙ্গুত্ব বা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলার মতো ঘটনা ঘটলে **সীমিত কিন্তু দ্রুত কিছু ত্রাণ** (Relief) দেবার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছিলে 'জনদায় বীমা আইন' (Public Liability Insurance Act, 1991) (দ্র.—*বিওবি*, জানু-মার্চ, 97)। এই আইন বলে শিল্প সংস্থাদির কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে 'পরিবেশ ত্রাণ তহবিল' গড়ে ওঠার কথা, জেলা কালেক্টর তথা জেলাশাসকের মাধ্যমে ত্রাণের আবেদনের দ্রুত (তিনমাসের মধ্যে) নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হবার কথা, বিপজ্জনক শিল্পাদির কাছ থেকে প্রিমিয়ামের অর্থ নিয়ে বীমা পলিসি হবার কথা। এই আইনেই স্পষ্ট করে বলা ছিল যে, **ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণ** (Compensation) আলাদা ব্যাপার। ত্রাণ প্রাপকরা পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণ দাবি করে আদালতে যেতে পারবে, যদিও তার পন্থা পদ্ধতি সম্পর্কে এই আইনে কিছু বলা ছিল না। বিমা আইন কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী তৈরি হয় নি, কিন্তু 1995-তে প্রণীত হলো নতুন আইন **দ্য ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ট্রাইবুনাল অ্যাক্ট**; উদ্দেশ্য ক্ষতিপূরণের দাবির দ্রুত ও যথাযথ নিষ্পত্তি করা। এই আইন নতুন করে আর-এক প্রস্থ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করল : ট্রাইবুনাল শুধু ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটাই দেখবে নাকি একই সঙ্গে ত্রাণের ব্যাপারও ট্রাইবুনালের অধীনে আনবে, তাই নিয়ে। কিন্তু ট্রাইবুনাল আইনও অপর্যাপ্ত একটি ছাপানো বই হয়েই আছে।

এরাজ্যে হুগলী জেলার কেশোরাম রেয়ন কারখানা থেকে 1997-এর জুন-জুলাই মাসে ব্যাপক বিষগ্যাস(কার্বন ডাইসালফাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড এবং হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেন সাফলাইড) লিকের ঘটনা ঘটে। এবং স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্য, ফসল, সম্পদহানি হয় ব্যাপক। জেলাশাসক '98-এর জানুয়ারিতে 'জনদায় বীমা আইন' অনুযায়ী দরখাস্ত আহ্বান করেন। কিন্তু তারপরেই সব ধামাচাপা পড়ে যায়। অবশেষে হাওড়া গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির কলকাতা হাইকোর্টের গ্রীন বেঞ্চে আবেদন, গ্রীন বেঞ্চের বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ, বিশেষজ্ঞ কমিটির সতেরোটি দরখাস্তের মধ্যে চৌদ্দোটি দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে রিপোর্ট, গ্রীন বেঞ্চের আদেশক্রমে জেলাশাসক পাঁচশো টাকা থেকে দশহাজার টাকা এবং মোট ছেচল্লিশ হাজার টাকা **ক্ষতিপূরণ** মঞ্জুর করে বিজ্ঞপ্তি জারি—মে '99-এ। হুগলীর জেলাশাসককে উদ্ধৃত করে প্রকাশিত খবরে বলা হলো, সারা দেশে এই প্রথম জনদায় বীমা আইন অনুযায়ী **ক্ষতিপূরণ** দেবার ঘটনা ঘটল! জেলা শাসকের উদ্যোগকে খাটো না করেও অবাক হতেই হয় কারণ ঐ আইনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, জেলাশাসক মহোদয় ত্রাণকেই ক্ষতিপূরণ বলছেন, এবং তার জন্য আইন বলবৎ হবার আট বছর পরেও এত কাঠখড় পোড়াতে হলো! একটা সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, সাংবাদিকরাই বুঝি জেলাশাসককে ভুলভাবে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু জেলাশাসকের স্বাক্ষরিত পূর্ণ বয়ানে দেখা যাচ্ছে যে, কার কত কেজি বেগুন নষ্ট হয়েছে বা বাছুর মারা যাবার জন্য কত কেজি দুধ পাওয়া যায় নি ইত্যাদি হিসেব করে 'বাজারদর' অনুযায়ী রীতিমতো টাকায় 'ক্ষতি'-র পরিমাপ করা হয়েছে এবং পাঁচশো থেকে দশহাজার টাকার **'ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ'** নির্ধারণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জনদায় বীমা আইনে সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ত্রাণ দেওয়া যায়। আরও মজার ব্যাপর হলো উক্ত বয়ানের শিরোনামে রিলিফ (ত্রাণ) কথাটি থাকলেও, কেস ধরে ধরে আলোচনার সময় কমপেনশেসন (ক্ষতিপূরণ) বলেই বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কি বলে অভিহিত করা যায় একে? অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি, নাকি অন্য কিছু?

তিন ॥ অনমনীয় আইন

বিচার ও শাস্তির ব্যাপারে আইন যথেষ্ট নমনীয় হলেও, প্রয়োজনীয় অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলি রীতিমতো অনমনীয়। আইন ও বিধিনিয়মগুলি প্রণয়নের সময় ভাবা হয় নি বা ভাবা যায় নি এরকম কোনো অভাবিত নতুন পরিস্থিতি যদি দেখা দেয়, তাহলে কি করতে হবে? যদি আইনে আইনে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলেই বা কি করা উচিত? আমাদের পরিবেশ আইন-কানুনগুলি কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে কোনো দিশা বা নীতি নির্দেশ করতে ব্যর্থ। সেই ইতিবাচক স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা তাদের নেই। ফলে প্রায় প্রতিটি দুর্ঘটনা বা উন্নয়ন বনাম পরিবেশ বিতর্কে দেখা যায়, চালু আইনগুলি অপ্রতুল, এবং সেই অজুহাতে আইনরক্ষকরাও পিছু হটেন। হাওড়ায় দাশনগরের অগ্নিকাণ্ডে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারগুলি কি ত্রাণ এবং ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন না? (সরকারি দাক্ষিণ্য নয়, ক্ষতিপূরণ)। কলকাতা ডক কি দেশের আইনকানুন না মেনে শুধু আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে পারে। (তেমনিই বলেছিলেন তাঁরা!)? কোনো রাজ্য সরকার বা তার কোনো দপ্তর কি পরিবেশে প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental Impact Assesment) না করেই বা কোনো এলাকার মানুষজনের মতামত যাচাই এর আইনী সংস্থান না জেনেই, এলাক বিশেষের নগরায়ণ বা শিল্পায়ণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে কাজে নেমে পড়তে পারেন?

চার ॥ বিসমিল্লায় গলদ

কোনো কোনো আইনজ্ঞ মনে করেন, পরিবেশ আইন ও তার প্রয়োগ নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, তা থেকে মুক্তি পেতে, সবগুলি আইনকে সংগৃহীত করে একটি মাত্র আধারে (Codified single Act on Environment) আনা দরকার। কিন্তু তাতেও কোনো সুরাহা হবার আশা করা যায় না, কারণ, আমাদের পরিবেশ আইন-কানুনগুলির মূল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই রয়েছে তাদের অন্তর্রোগ বা অপপ্রয়োগের বীজ। দু-একটি উল্লেখ করা যাক।

ক. নিবারণ নয় নিয়ন্ত্রণ : আইন আশ্রিত পরিবেশ ভাবনায় 'নিয়ন্ত্রণ' (Control) বলা ভালো 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ' প্রাধান্য পেয়েছে, নিবারণের (Prevention) চিন্তা নয়। জল ও বায়ু আইনের শিরোনামে "দূষণ (নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ)" কথাগুলি আছে ঠিকই, এবং এই আইনের সংস্থান মেনেই প্রাথমিকভাবে 'দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ পর্যদ' গঠিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু 'নিবারণের' বোঝা হাল্কা করে তাদের শুধু 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ' হয়ে যেতে খুব বেশি দেরি হয় নি।

বস্তুত, দূষণ যাতে না ঘটে বা কম ঘটে সে লক্ষ্যে পর্যদের কাজকর্ম পরিচালিত হয় না। তা তাদের কর্মীনিয়োগ, পরিকাঠামো বা অর্থ-বরাদ্দের ধরণ-ধারণ-পরিমাণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ঘটে যাওয়া দূষণ দুর্ঘটনার মোকাবিলা (প্রতিকার নয় কিন্তু) করার প্রচেষ্টাতেই পর্যদ জেরবার। নিবারণমূলক কাজকর্ম যেমন শিক্ষা, গবেষণা, সমীক্ষা (জল, বাতাস, মাটির গুণাগুণ, পরিবর্তনের প্রকৃতি ইত্যাদি), আপৎকালীন পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ, গণসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য স্বচ্ছতার সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তথ্য জানানো ইত্যাদি কাজ পর্যদ যেটুকু নাম কা ওয়াস্তে করার প্রয়াস পায় তা নিতান্তই দায়সারা, অপরিকল্পিত ও নিস্ফল।

খ. শাস্তিদান ও ভীতিপ্রদর্শন : নিয়ন্ত্রণমূলক চিন্তাভাবনারই যে পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ আইনকানুনগুলির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে তাকে বলা যায় শাসন তথা শাস্তিদান ও ভীতিপ্রর্শন। ইংরেজিতে একেই বলা হয় Pollutess Pay (সংক্ষেপে PP) নীতি। অর্থাৎ দূষণ ঘটালে বা আইন না মানলে জরিমানা কারাবাস হিসেবে ভয়ঙ্কর আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা তথা সংস্থান রাখা। PP নীতিকে তাই Prosecute and Punish-ও বলা যায়।

বলা বাহুল্য, বিশ্বজুড়েই—বিশেষত ইওরোপ আমেরিকায় পরিবেশ আইনকানুনে এই নীতিই অনুসরণ করা হয় ব্যাপকভাবে। আমরাও সেখান থেকেই শিখেছি। তবে যা শিখি নি তাহলো ঐসব দেশে শুধু এই নেতিবাচক দিকটিকেই অনুসরণ করা হয় না, তার সঙ্গে সমান বা বেশি জোর দেওয়া হয় ইতিবাচক নানা কার্যক্রমেও। যেমন, দূষণরোধ ব্যবস্থাপনা (management) এবং দূষণ নিবারণের জন্য উদ্ভাবনী কাজে অংশগ্রহণ বা উৎসাহদান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে নিয়মিত আদানপ্রদান, নিরন্তর পরিবেশের অবস্থার পর্যালোচনা ইত্যাদি। PP নীতি তখন আর নিছক

শাস্তিমূলক থাকে না, অন্যান্য কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। তাই অনেকটা রূপায়ণও করা যায়।

এসব না করে শুধু PP-নীতিচালিত আইন প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে কি আমরা পারব রোধ করতে পানীয় জলের আর্সেনিক বা ক্লোরাইড দুষ্ট হওয়া, সুন্দরবনের লবণ কমে যাওয়া, গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টন মাটি ধুয়ে যাওয়া, ভূগর্ভজলের ভাণ্ডার ভর্তি না হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্থানীয় কৃষিব্যবস্থার ভেঙে পড়া? এসব বিপর্যয়ের জন্য তো কারও বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা বা শাস্তি দেওয়া যাবে না! এই নেতিবাচক PP-নীতি আমাদের আইনী প্রক্রিয়াকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে অপরাধের প্রকৃতি, সনাক্তকরণ, অভিযোগ, শাস্তি ইত্যাদির সংজ্ঞা প্রকরণ নিয়েই ধারার পর ধারা সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু একজন বা দশজন কারখানা ম্যানেজার বা মালিক দু-দশলক্ষ টাকা জরিমানা দিলে বা তাদের পাঁচ বছরের জেল হলে (না হয় ফাঁসিই হলো!) যে পরিবেশের ক্ষতি আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে না, জল-মাটি-বাতাস শুদ্ধ হয়ে উঠবে না, অসুস্থ আহত মৃত নাগরিকের কোনো সুরাহা হবে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা কমবে না—সে সব কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে।

ক্ষেত্রবিশেষে PP নীতির একটা পশ্চাদাঘাতও (back-lash) ঘটে এবং সেটি অনেকসময় অভিযুক্তের মননে বৈধতা পেয়ে বসে : যদি ফাইনই দিতে হয় তাহলে আর দূষণ বন্ধ করার পেছনে সময় ও অর্থ নষ্ট করা কেন? দুলাখ খরচ করলে যদি দূষণরোধী যন্ত্র বসানোর এবং ব্যবস্থা গ্রহণের দশ লাখ বাঁচানো যায় তবে সস্তা ও সহজ রাস্তাটাই কেন নিই না? সুতরাং, তার PP নীতি হয়ে দাঁড়ায় —Pay and Pollute — পয়সা দাও, দূষণ চালিয়ে যাও!

গ. জাতীয় পরিবেশ নীতি ও জাতীয়-নীতির অনুপস্থিতি : পরিবেশ আইনের সার্থকতা হতে পারত তাদের রূপায়ণে, যার রূপায়ণ সার্থকতা পেতে পারত জাতীয় পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ণে। কিন্তু যদি আমাদের কোনো জাতীয় পরিবেশ নীতিই না থাকে, না থাকে জাতীয় উন্নয়ন নীতি, তাহলে পরিবেশ আইনকানুনও দিশাহীন ও অসংলগ্ন হতে বাধ্য। রূপায়ণেও থাকতে পারে না কোনো নিষ্ঠা। 1980 থেকেই আমাদের আছে 'ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট' এবং তার নানাবিধ কমিটি, আছে ন্যাশনাল কমিটি অফ এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং, আছে একটি পুরো মন্ত্রক, কিন্তু আজও নেই কোনো জাতীয় পরিবেশ নীতি।

উন্নয়ন সম্পর্কেও আমাদের একটা অবস্থান আছে ঠিকই, কিন্তু কোনো জাতীয় নীতি? আজকের দিনে পৃথিবীর সব দেশই টেঁকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) কথা বলে থাকে, যে উন্নয়নের ধারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অব্যাহত থাকবে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ ঘোষণাপত্রে (Charter on Environment, Stockholm, 1972) স্বাক্ষর দিয়ে আমরাও অঙ্গীকার করে বলেছিলাম —পরিবেশ সুরক্ষিত রেখেও উন্নয়ন সম্ভব—কিন্তু কাজের বেলায় আমরা তা বেমালুম ভুলে গেছি। শিল্পকেন্দ্রিক পশ্চিমী পুঁজিনির্ভর উন্নয়নের ধাঁচকেই আমরা বরণ করেছি এবং শিল্পায়ণ নিয়ে এতই উদার ও ব্যগ্র যে, রাজ্যে রাজ্যে প্রায় প্রতিযোগিতাই শুরু হয়ে গেছে। সরকারের পক্ষে কখনও তেরো দফা কখনও সতেরো দফা অগ্রাধিকারের তালিকা ঘোষিত হচ্ছে—শিল্পস্থাপন ও তারজন্য বাতাবরণ তৈরি সর্বদাই সেখানে প্রথমস্থানে থাকে। কিন্তু শেষতম স্থানেও পরিবেশ থাকে না। পরিবেশের নানাদিক দেখভালের দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের কাছেও সঠিক বার্তাটি ঠিক পৌঁছে যায়। সরকার বা সরকারি সংস্থারাই যদি পরিবেশ আইনের ন্যূনতম বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে, তাহলে অন্যদের প্রতি বর্ষিত হালুম-হুলুম শেষ পর্যন্ত মিউ-মিউতে পর্যবসিত হবে, এতে আর আশ্চর্য কি?

রবীন মজুমদার

পরিবেশ বিষয়ে প্রবন্ধ সংকলন

রবীন মজুমদার-এর

পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ

মূল্য : ত্রিশ টাকা

প্রকাশক

পি 18 মেঘনাদ আবাসন

সাহা ইনস্টিটিউট কো-অপরেটিভ সোসাইটি

কলকাতা 700 059

রি পো র্ট

□

কলকাতার নিকাশি খাল সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য গণআন্দোলন

সেপ্টেম্বর '99 এর শেষ সপ্তাহে কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার বহু মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়েন এবং অবর্ণনীয় দুর্দশার মুখে পড়েন। অনেকের মনে পড়ে যায় আটাত্তরের ঠিক সেপ্টেম্বরের শেষের সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা। কিন্তু এবারে ব্যাপারটা একটু আলাদা ছিল। আটাত্তরে একটানা তিনদিন প্রবল বর্ষণ হয়েছিল, শহর ও শহরতলীর নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছিল, যোগযোগ ব্যবস্থা হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। কিন্তু এবারে বৃষ্টি হয়েছিল মাত্র কয়েকঘন্টা। এবং বৃষ্টি থামার পরও বহু এলাকার মানুষ আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন জল কমার বদলে ক্রমাগত বেড়ে গেছে। তিন থেকে দশদিন পর্যন্ত কিছু কিছু এলাকা ছিল জলমগ্ন। অনেকেই তাই এবারের ব্যাপারকে বানভাসি বলতে চান না, বলেন জলভাসি। এবারের আরও বিশেষত্ব এই যে, এমন বহু এলাকাও জল-কবলিত হয়েছিল যেখানে আটাত্তরে কিছুই হয় নি। কলকাতা কর্পোরেশনের জনৈক কর্তাব্যক্তি 'প্রাকৃতিক দুর্যোগে, কি করা যাবে' গোছের মন্তব্য করে হাস্যস্পদ হয়ে পড়েছিলেন, কেননা মানুষের কাছে লুকিয়ে রাখা যায় নি যে, কলকাতার জলনিকাশির যেটুকু অপ্রতুল ব্যবস্থা আছে তা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়াই এবারের দুরবস্থার মূল কারণ। অল্পসময়ে প্রবল বর্ষণ, নতুন গড়ে ওঠা বসতি অঞ্চল থেকে জল বেরোনোর পথ না থাকা, একই সঙ্গে গঙ্গার জোয়ারের জল বিভিন্ন খালের সংযোগস্থলের ভাঙা গেট দিয়ে ঢুকে পড়া সব মিলিয়ে অবস্থা সত্যিই সঙ্গীন ও করুণ করে তুলেছিল। ঐ সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও গণমাধ্যমে যেমন মানুষের দুরবস্থার ছবি বেরোতে লাগল ক্রমাগত, তেমনি প্রকাশিত হয়ে পড়ল এমন সব কুকাজের কথা যা নিকাশী খালগুলিকে অকেজো করে তুলছে। বহুদিন ধরে পুঞ্জীভূত সমস্যার পাহাড় যে এভাবে রাজ্য ও পুর প্রশাসনকে বে-আব্রু করে তুলবে তা বোধহয় তাঁরা আঁচ করতে পারেন নি।

উত্তর কলকাতার চারটি ওয়ার্ড ও সল্টলেক, লেকটাউন, বাঙুর, দমদম পার্ক, কালিন্দী ইত্যাদি সহ উত্তর চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার একমাত্র মাধ্যম বাগজোলা খাল। দীর্ঘদিনের অবহেলা ও অপব্যবহারে কতখানি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে তাও এবার হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন ঐ সব এলাকার মানুষ। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন হিসেবে পরিচিত এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন, রাস্তা অবরোধ করেছেন। দেখেছেন অকেজো পাম্প দিয়ে জল বের করবার হাস্যকর চেষ্টা, একদিক দিয়ে বের করে অন্য দিক দিয়ে অন্য এলাকায় জল ঢোকাবার এবং এমনকি এক বসতির জল দিয়ে অন্য এক বসতিকে বিপন্ন করবার প্রহসন।

জল নেমে গেছে অবশেষে, ক্ষোভ-রাগও স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু বাগজোলা সংস্কার ও উন্নয়ন কমিটির কিছু মানুষ উপলব্ধি করেছেন যে, এভাবে আবার সবকিছু ভুলে গিয়ে চুপ করে থাকলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদ এড়ানো অসম্ভব। বিগত বছর চারেক ধরে তাঁরা সরকারি আধা-সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে অনেক আবেদন-নিবেদন করেছেন, কিছু মাত্র কাজ হয় নি তাতে। এবারে তাই তাঁরা সাধারণ মানুষের দ্বারস্থ হবার, গণ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

গত একতিরিশে অক্টোবর বাগজোলা সংস্কার ও উন্নয়ন কমিটি অন্যান্য অনেকগুলি নাগরিক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় একটি গণ অবস্থানের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বিভিন্ন এলাকার মানুষজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অবস্থানে যোগ দেন এবং অবস্থান কর্মসূচীর জন্য অর্থসাহায্য করেন। যদিও একসঙ্গে কোনো সময়ই বিরাট সংখ্যক মানুষ হাজির হয় নি, তবুও সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উৎসাহী মানুষের প্রবাহ বজায় ছিল। কামারহাটি, বরানগর, দমদম, উত্তর ও দক্ষিণ দমদম, রাজারহাট, গোপালপুর পুরসভা এলাকা এবং রাজারহাট পঞ্চায়েত এলাকা থেকে পাঁচ শতাধিক মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। বাগজোলা খাল ও দমদম পার্ক বাঙুরের সংযোগস্থলে সদাব্যস্ত যশোর রোডের পাশে এই সারাদিন ব্যাপী আয়োজন পথচলতি ও বাসচলতি মানুষও দাঁড়িয়ে পড়ে বা হাত নেড়ে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। ম্যাপ ছবি ও কাগজের কার্টিংএর ছোট প্রদর্শনীটুকু সর্বক্ষণই অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল। বর্ক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে আবৃত্তি, গান, কবিতাপাঠ গণ-অবস্থানকে যেন গণসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে তুলছিল মাঝেমাঝেই।

বক্তাদের মধ্যে অনেকেই পুরসভাগুলির অপদার্থতা এবং সরকারের গাফিলতি ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, খালপাড়ের সেচ দপ্তরের জমি দখল হয়ে

গিয়ে অবৈধ খাটাল, নার্সিং-হোম পর্যন্ত গজিয়ে উঠেছে এবং এ-ব্যাপারে ডান-বাম সমস্ত রাজনৈতিক দলই সমানভাবে মদত দিয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় খাল বুজিয়ে বা তার গতি রোধ করে কিছু গরীব মানুষও বসবাস করছে। রাজনৈতিক মদতেই এসব হয়েছে। অবস্থান সমাবেশ তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং গঙ্গানগরের শূন্য-গোয়াল, সরকারি খাটাল, খালপাড়ের খাটালগুলিকে অবিলম্বে সরিয়ে দেবার দাবি জানানো হয়। খাটালের গোবর সরাসরি খালে পড়ছে, মৃত গরু-বাছুরে খাল ভর্তি হয়ে যাচ্ছে—এর আশু প্রতিকার দাবি করা হয়।

নাগরিক মঞ্চ-র প্রতিনিধি বলেন, ব্যাপারটা শুধু বাগজোলা খাল সংস্কারে সীমাবদ্ধ নয়। কলকাতার সবকটি নিকাশি খাল এবং সেখানে এসে পড়া অন্যান্য নিকাশি খাল অর্থাৎ গোটা নিকাশি ব্যবস্থাটাই একই রকমের দুর্দশাগ্রস্ত। সংস্কারের কথা উঠলেই কর্তারা বলেন, টাকা নেই অথচ গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের টাকা এলে টাকার কোনো অভাব থাকত না। কিন্তু ঐ খাতের পুরনো টাকার হিসেব না দেবার জন্য নতুন টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি প্রশ্ন তোলেন এইসব খাল কি শুধু সেচ দপ্তরের? নগরোন্নয়ন দপ্তরের নয় কেন? পরিবেশ দপ্তর কেন এতে খরচ করবে না?

রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটির প্রতিনিধি অবস্থান সমাবেশে উপস্থিত শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, রাজারহাটের যে এলাকায় 'নতুন কলকাতা' গড়ে ওঠার তোড়জোড় শুরু হয়েছে, সেখানে দুটি বিলকে ভরাট করে তবেই বা কুলটি গাঙ বা বাগজোলা বিদ্যাধরী রায়মঙ্গলের পথে জল চালান করে। এখন, সেগুলি বুজিয়ে শহর হবে। বাগজোলার ওপরের দিকের এই অংশের সংস্কার হলেও রাজারহাট বিলের জল টানা বন্ধ হলে, জল নামবে না। ফলে অবস্থা আরও সঙ্গীনই হবে। তিনি জানান, রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটি তাই নগরায়ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। কেননা সরকার নিজেই এক্ষেত্রে আইন কানুন মানছে না। বাগজোলার সংস্কার ও উন্নয়নের আন্দোলন তাঁদের আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা বলেই তিনি বিশ্বাস করেন।

বিদ্যাধরী সংস্কার সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধি জানান বিদ্যাধরী নদী বুজে গেছে। দখল হয়ে গেছে, আরও হচ্ছে। কৃষকরা ফসল ফলাতে পারছেন না। বিদ্যাধরীর পুনর্জীবন হাজার হাজার কৃষকের পুনর্জীবন। পাঁচহাজার কৃষক সম্প্রতি বারাসতের 'বিদ্যাধরী ভবনে' বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। বাগজোলার আন্দোলনের অংশীদার হতে চান তাঁরা।

অবস্থান-সমাবেশের উৎসাহ উদ্দীপনা আরাজনৈতিক গণআন্দোলনের পাথেয় হবে—এই আশা ব্যক্ত করে অবস্থান শেষ হয়।

রাজি বিশ্বাস

□□

পুকুরচুরিতে বাদ সাধল বিজ্ঞানক্লাব

হালিশহরের বীজপুর থানার অধীন জেটিয়া (বেলেপুকুর) অঞ্চলে প্রায় সাড়ে ছ লক্ষ বর্গফুট বিস্তৃত একটি জলাশয় প্রকৃত অর্থেই ঐ অঞ্চলের মানুষের কাছে ছিল এক পরম আর্শীবাদ। হঠাৎই নিরানব্বই সালের গোড়ার দিকে সেটা প্রায় বুজে গিয়ে জমিতে পরিণত হলো। মানুষজন অবাক দুঃখিত ক্ষুব্ধ হলেও কেউ সাহস পায় নি প্রতিবাদ করার। অবশেষে কাঁচড়াপাড়া 'বিজ্ঞান দরবার' প্রতিবাদ করে চিঠি দেয় উত্তর চব্বিশ পরগণার এ ডি এম তথা এল আর এবং ডি এল আর ও-র কাছে (10.3.99). ব্যারাকপুর-1 এর ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসার দ্বারা তদন্ত করিয়ে এ ডি এম অভিযোগের সত্যতা যাচাই করেন এবং পুকুরের তিন মালিক—সুধীর ঘোষ, নিখিল ঘোষ ও শম্ভুনাথ ঘোষের ওপর নোটিশ জারি করেন। এতে মালিকদের 26.8.99 তারিখে এ ডি এমের এজলাসে হাজির হয়ে কারণ দর্শাতে বলা হয় যে, কেন তাঁরা নথিভুক্ত পুকুর ভরাট করেছেন আর কেনই বা তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে এ ডি এমের এজলাসে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, তাঁরা মোটেই পুকুরের চরিত্রবদলের চেষ্টা করেন নি, কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছিল, কিন্তু সে-সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শুনানির পর এ ডি এম আদেশ দেন যে, এক মাসের মধ্যে উক্ত প্লটকে তার পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ পুকুরে পরিণত করতে হবে। এবং সেটা করতে হবে মালিকপক্ষকেই, নিজেদের খরচে। আদেশ কার্যকর হলো কিনা তা দেখার ভার দেওয়া হয় ব্যারাকপুর-1 এর ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসারকে। জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতকেও অবহিত করা হয়। কিন্তু নিরানব্বই-এর শেষ পর্যন্ত এ ডি এম এর আদেশ কার্যকর করা হয় নি। জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত আশ্চর্যরকম নীরবতা ও উদাসীনতা দেখিয়ে আসছিল আগাগোড়াই, এখনও তারা নিষ্ক্রিয়। কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবার আবারো অভিযোগ জানিয়েছে এ ডি এম-এর দপ্তরে।

আশা করা যাক জলাশয়টি রক্ষা পাবে এবং বিজ্ঞান দরবার এবং অন্যান্য শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের সহযোগিতায় সেটি একটি সুন্দর সুরক্ষিত কার্যকর রূপ নেবে।

প্রদীপ দত্ত

□□□

ঝিল রোডের শেষ ঝিল

কলকাতার দক্ষিণে ঢাকুরিয়া থেকে যাদবপুর রেললাইনের সমান্তরালে চলা ঝিল রোডের গা-ঘেঁষা ঝিলের ঝিলমিল-দুদশক আগেও দেখা যেত ট্রেন থেকেই। এক সময় রাস্তার দুপাশে ছড়ানো ছিটানো ছিল ঝিল আর পুকুর। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে সব, একটি বাদে। আট বিঘার সেই শেষ ঝিলেরও অনেকখানি দখল হয়ে গেছিল দোকান গুদাম কাঠকল আর বসতিতে।

পরিবেশ চর্চা করা কিছু মানুষের 'পারস্পরিক সাহায্যের সেতু' 'বসুন্ধরা' (10 সেকেন্ড রোড, ইস্টার্ন পার্ক, সন্তোষপুর কলকাতা 700 075) এবং স্থানীয় মানুষজন তাঁদের নাছোড়বান্দা উদ্যোগে ঝিল রোডের এই শেষ ঝিলকে আবার মুক্ত করে দিতে পেরেছেন। অবশেষে মন্ত্রী অফিসার কাউন্সিলর পুরসভাও নাগরিকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। নোংরা বদ্ধ পানাভর্তি ঝিলের পানা পরিষ্কার হয়েছে, পচা জল পাম্প করে সরানো হয়েছে এবং ঝিলের দখল করা জমিও উদ্ধার করা হয়েছে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা জেলেপাড়ার তেরোটি পরিবারের পুনর্বাসনেরও ব্যবস্থা করা গেছে।

ঘনবসতি শহুরে এলাকার এই এক টুকরো জিয়নকাঠি, কিছু সবুজ, কিছু পাখি, নির্মল বাতাস, কিশোরের সাঁতার, দশমীর প্রতিমা নিরঞ্জন সব স্মৃতি আবার মেদুর হয়ে উঠেছে। আগামীতে ঝিলের নবকলেবর পাবার প্রত্যাশায়।

ছোট্ট কাজ, কিন্তু সহজে হয় নি। গণস্বাক্ষর অভিযান, সমীক্ষা, পদযাত্রা, সভা-সমিতি, পোস্টার প্রদর্শনী, টাকা তোলা, পানা পরিষ্কার করতে নিজেরাই নেমে পড়া, আদালতে মামলা, রাজনৈতিক দলাদলি সব পেরিয়ে ঝিল আজ আবার ঝিল। আবার সে হয়ে উঠবে অঞ্চলের সংস্কৃতির অঙ্গ। দুহাতে টেনে নেবে কিছু ধুলো ধোঁয়া আর গ্যাস—আগামী শিশুদের বাতাসকে শ্বাসযোগ্য করে তুলতে। আর সহ-সংগ্রামীরা পেতে পারেন প্রেরণার ইন্ধন, অভিজ্ঞতার উত্তাপ।

র. ম.

প রি ক্র মা

□

'রাস্তা কারো একার নয়' তা'বলে সবারও কি'?

কলকাতার রাস্তায় বাস-লরি চাপা পড়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে জনতাও নেমে পড়ে কাজে। দ্রুততার সাথে করে ফেলে গুটি কয়েক কাজ। প্রথমে বাস বা লরি বা টেম্পোটিতে আগুন ধরানো। ড্রাইভার, কন্ডাক্টর, ক্লিনারকে ধরতে পারলে পেটানো। তারপর পথ অবরোধ করা। এরপর আসে পুলিশ। কথা কাটাকাটি-বচসা অবশেষে ইটপাটকেল-টিয়ারগ্যাস ছোড়াছুড়িতে দাঁড়ায়। ফের আহত হয় কজন। কখনো-সখনো নিহতও। এরপর ট্রাফিক জ্যাম। ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায়। কাজেকর্মে রওনা হওয়া লোকজনের বিপর্যস্ত অবস্থা। দাঁড়িয়ে থাকা বাস-ট্রাম-ট্যাক্সিতে সেদ্ধ হতে থাকেন গরমে এবং পেট্রোল-ডিজেলের ধোঁয়ায়। মেজাজ চড়তে থাকে। মুণ্ডুপাত শুরু হয় যার যাকে এজন্য দায়ী মনে হয় তার উদ্দেশ্যে। এক সময় তাও থিতিয়ে আসে— ক্লান্তিতে, অবসাদে।

ওপরওয়ালা (ঈশ্বর নয়) আলোচনায় বসে। হুকুম জারি হয়। নতুন কিছু নিয়মও। মোবাইল আর লাঠি হাতে ট্রাফিক পুলিশ নেমে পড়ে পথে। কিছু ড্রাইভার-কন্ডাক্টরদের ধরা হয়। ফাইন হয় বা রফা হয়। 'বি-পথগামী' কিছু পথচারীও বাদ পড়েন না। এমন উত্তেজনা বেশিদিন ধরে রাখা যায় না। থিতিয়ে আসে সব কিছু। তারপর সব কিছুই যে কে সেই।

তবে এ-যাত্রায় ওপর থেকে হুম্‌কিটা একটু জোরেই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নতুন কিছু নিয়মও জারি হয়েছে নাকি। ফলে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটছে রোজ। সার সার বাস রাস্তার বাঁ ধার ধরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার ডান ধার ঘেঁষে মোটর ট্যাক্সি টেম্পো। এক একটি বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অফিস-মুখো রাস্তার দিকে তাকালে যতদূর দেখা যায়, দেখা যাবে এমন গায়ে গায় লাগিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বাস ও অন্যান্য গাড়ি। মাঝে-মধ্যে নড়ে উঠছে সব। এক সাথে। চলছে খানিক। ফের দাঁড়িয়ে পড়ছে। বাসগুলোতে ভিড় বেশ পাতলা। যাত্রীরা অনেকেই পথে নেমে হাঁটছেন। আবার কখনও উঠে পড়েছেন বাসে। এগোচ্ছেন খানিক। ফের নামছেন। হাঁটছেন। এইভাবে চলছে অফিস-কাছারি যাত্রা। সপ্তাহ পেরিয়ে গেল এইভাবে। দেখা যাক চলে কদিন। লোকেও সয় কতদিন।

কলকাতার ট্রাফিক সমস্যার মূলে কি? এ-ব্যাপারে ওপরওলারা একমত। দায়ী দায়িত্বজ্ঞানহীন বাসচালক পথচারী ও হকার। রাস্তার পরিমাণ নিয়ে হিসেবের কারচুপির কথা ছেড়ে দেওয়া গেল। গাড়ির সংখ্যার কথা বিশেষ বলেন না প্রায় কেউই। বিরাশি-তিরাশি সাল নাগাদ কলকাতার রাস্তায় চলা গাড়ির সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ একষট্টি হাজারের ওপর। আটানব্বই-নিরানব্বই সালে সেই সংখ্যা সাত লক্ষ ছুঁই ছুঁই করছে। এর পরেও দুনিয়ার তাবৎ অটোমোবাইল কোম্পানি হরেক ডিজাইন ও সাইজের গাড়ির পসরা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে এই দেশের বাজারে।

যৎসামান্য প্রাথমিক কিস্তির টাকা যোগাড় করতে পারলেই হাতে পাওয়া যাচ্ছে সেসব গাড়ি। এমন অবস্থায় গাড়ির সংখ্যা নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করলে তেনারা চটে যাবেন না? ফলে রাস্তা এখন গাড়ির জন্যই। কেবল রাস্তা কেন?— বাড়িও। ক্যামাক স্ট্রিট অঞ্চলে গাড়ি রাখার জন্য ক-তলা বাড়ি বানানো যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন ওপরওলারা!

ওপরওলারা তাদের মতো মাথা ঘামাচ্ছেন। —ঘামান। ভুক্তভোগীরা কি করবেন সেটা তাদেরই ঠিক করতে হবে। অনেকে অনেক প্রস্তাব রাখছেন। দৈনিক কাগজের চিঠিপত্র বিভাগে চোখ বোলালেই সেটা নজরে পড়ে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় অনেকে অনেক প্রস্তাব দিচ্ছেন। যেমন অনেকে তো বলছেন 'প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা ন্যূনতম করা হোক। তার বদলে যাত্রীবাহী গাড়ির সংখ্যা ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো হোক।

কিছু কিছু রাস্তা পুরোটাই আর কিছু রাস্তা অংশত সাইকেল যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক। কলকাতাকে বেষ্টন করে আছে যে-সমস্ত খাল তার নাব্যতা বাড়িয়ে সেখানে জলযান চালানোর বন্দোবস্ত করা হোক। খালের দু-ধার ধরে রাস্তা যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহার করা হোক। ট্রাম যাত্রী-পরিষেবা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হোক। এবং আরো উন্নত করা হোক। ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো নিঃশব্দ প্রার্থনাতেই কি এসমস্ত ঘটবে?

— কস্মিনকালেও না।

— তাহলে?

তাহলে দাবি আদায়ের জন্য যেমন সব ক্ষেত্রেই সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ প্রয়োজন, এখানেও তাই করতে হবে।

তবে হ্যাঁ, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দিয়ে কোনো সুফলই মিলবে না সেটাও ঠিক।

র.চ.

□□

দৈনিক মাত্র চার-শ টাকার জন্য এত !

লোকসভার নির্বাচন হয়ে গেল। দেশ-সেবার জন্য মরিয়া লড়াই হলো দেখলাম আমরা সবাই। যারা জিতলেন তারা কাজে নেমে পড়েছেন। হারলেন যারা তারা ফের কত তাড়াতাড়ি আরেকবার লড়াই-এর আয়োজন করা যায় তার ফন্দিফিকিরে মন দিয়েছেন নিশ্চয়ই।

কিন্তু প্রশ্ন হলো যারা দেশ সেবার জন্য এত বড় দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন, তাদের জন্য কি বন্দোবস্ত করেছে দেশ? ব্যবস্থা অপ্রতুল বলেই আমার অনুমান ! কি সেগুলি? — লোকসভা চলাকালে উপস্থিতি-খাতায় সই করলেই দিনে চারশো টাকা। সদস্য হিসেবে মিটিং-বৈঠকে যোগ দিলে একই হারে ভাতা। প্রত্যেক সদস্যকেই খানতিনেক কমিটিতে তো থাকতেই হয়। নিজের এলাকার মানুষজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মাসিক আট হাজার টাকা। নিজের এলাকার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ দু-কোটি টাকা। টাকা হাতে পাওয়া যায় না। তাঁর সুপারিশ মতো কাজ হবে। কাজ যিনি করবেন তিনি জেলা-দপ্তর থেকে টাকা পাবেন। লোকসভার সদস্য হিসেবে তাঁর একটি অফিস চাই। এজন্য মাসিক বরাদ্দ আড়াই হাজার। অফিসে দু-জন সহকারী রাখতে পারেন। তাঁদের প্রাপ্য মাসে ছ-হাজার। সদস্য মহোদয় একটি কমপিউটার পাবেন ব্যবহারের জন্য।

লোকসভার অধিবেশনে যোগ দিতে বা কোনো সরকারি মিটিং-এ যোগ দিতে যেতে পারবেন প্লেনে। — বিনামূল্যে। কিছু শর্ত-সাপেক্ষে পরিবারের লোকজনও এই সুবিধে পেতে পারেন। লোকসভার সদস্য কার্ড থাকলে ট্রেনে যেখানে খুশি যতবার খুশি যেতে পারেন। নিখরচায়। ট্রেন মানে এয়ার কন্ডিশনড কোচে। পরিবারের লোকজনও এই সুবিধে নিতে পারেন। লোকসভার অধিবেশন ছাড়াও বছরে বত্রিশটা ট্রিপ নিতে পারেন প্লেনে।

দুটি টেলিফোন তিনি পাবেন ব্যবহারের জন্য। বছরে একলক্ষ কল ফ্রি। রাজধানীতে থাকার জন্য ফ্ল্যাট বা বাংলো পাবেন। বাংলো সাজানোর জন্য তিরিশ হাজার টাকা। এর পরেও টিভি-ফ্রিজ-কুলার ইত্যাদি দিয়ে সাজসজ্জা করাতে চাইলে করতে পারেন। এজন্য সামান্য কিছু অর্থ দিতে হবে। গাড়ি কেনার জন্য লোন পাবেন।

ফিরিস্তিটা দেখতে লম্বা হলেও, সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে গেলে এটা কিছুই নয়। আমার তাই মনে হয়। একজনকে একথা বলায় তিনি চটে লাল। বললেন— দৈনিক চার-শ টাকা ভাতা, আর ওই ছিঁটে-ফোঁটা সুবিধের জন্য অমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। মূর্খ আর কাকে বলে?

— কি জানি, হবেও বা।

র.চ.

□□□

জয়শ্রী ও তাকে ঘিরে আর সকলে

জয়শ্রী দত্ত অবশেষে মারা গেল। গত সতেরোই নভেম্বর। দীর্ঘ চোদ্দো বছর অসুস্থতার সাথে লড়াই করেছে ও। সাথে লড়েছে আরো অনেকে। ওর মা দাদা বৌদি ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতি-অপরিচিত বহুজন। সহযোগিতা-সহমর্মিতার এক অপূর্ব নজির গড়ে উঠেছিল জয়শ্রীকে বাঁচানোর প্রেরণায়।

কিড্‌নির অসুখে পড়েছিল জয়শ্রী। কতই বা বয়স তখন তার। বছর ষোলো হবে। যেদিন পিজি হাসপাতাল থেকে জানাল যে ওর কিড্‌নি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হবে, সেদিন মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল ওর পরিবারের লোকজনের।— সে তো বহু টাকার ব্যাপার! নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের পক্ষে কি সম্ভব সেই অর্থ সংগ্রহ করা? কিন্তু দেখা গেল, সেই বিপদের দিনে জয়শ্রীর দাদা পুচনের বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীররা সবাই এগিয়ে এল। জানাল—ভয় কি, আমরা তো আছি।

খড়দহ স্টেশনের কাছে নতুনপল্লী লাগোয়া এলাকাতেই ওদের বাস। কিছুকাল আগেই সেখানে গড়ে উঠেছিল 'খড়দহ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' নামের একটি সংস্থা। এলাকার তরুণ ও যুবকেরা এর উদ্যোক্তা। নানান সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজে নিয়োজিত ওরা। এরাই এগিয়ে এল জয়শ্রীর চিকিৎসায় সহায়তা দিতে। জয়শ্রীকে নিয়ে যাওয়া হলো ভেলোর হাসপাতালে। পরিবারের লোকজন ছাড়াও বন্ধু-কজনও গেল সাথে। বাদ বাকিরা নেমে পড়ল অর্থ-সংগ্রহের কাজে। ট্রেনে ট্রেনে, বিভিন্ন প্লাটফর্ম ও স্টেশন চত্বরে ঘুরে ঘুরে চলল অর্থ সংগ্রহের কাজ। সকাল থেকে সন্ধ্যে। এই অভিযান ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন গণবিজ্ঞান সংগঠনের মধ্যে। ছড়িয়ে পড়ল কিছু কিছু স্কুল-কলেজে ও অফিস-পাড়ায়।

মায়ের দেওয়া একটি কিড্‌নি দেহে নিয়ে ফিরে এল জয়শ্রী। সকলেই খুশি। কিন্তু বেশিদিন টিকলো না সেই খুশির মেজাজ। অচিরেই নানান ধরণের অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল জয়শ্রীর দেহে। ফিরে ফিরে যেতে হতে লাগল সুদূর ভেলোরে। কি বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হলো বারবার, সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দমবার পাত্র নয় ওই তরুণ-যুবকেরা। এই চোদ্দো বছর ধরে নিরলসভাবে সংগ্রহ করে গেছে সেই অর্থ। অবশেষে স্থায়ী আস্তানা ঠিক করতে হয়েছে ভেলোরে। সেখানে গিয়ে দিনের পর দিন থেকেছে বন্ধু-বান্ধব পরিবারের লোকজন। সেখানেও জুটে গেছে সহযোগী বন্ধু-বান্ধব। যারা নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে এসেছে একতাল। এমন নজিরে মুগ্ধ না হয়ে পারে নি হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ও সহযোগী কর্মীরা। জয়শ্রী একটি সর্বজন পরিচিত নাম হয়ে উঠেছিল সেখানে ও আশপাশে। জয়শ্রী মারা গেলেও তাকে ঘিরে যে সহমর্মী বন্ধু গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে সেখানে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে উপকৃত হয়েছে বিপদগ্রস্ত আরো অনেক পরিবার। আগামীদিনেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এর সুফল যদি অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এই বন্ধুত্বের বন্ধন।

বছর দুই আগে জয়শ্রীর সাথে শেষবার দেখা হয়। আমাদের বন্ধু—ডাক্তার সীতেশের ওখানে। সেদিন একটু বিমর্ষ লেগেছিল ওকে। বলেছিল—আর ভালো লাগে না। আসলে ওকে নিয়ে সকলের এই টানাপোড়েনের জন্যই বোধহয় ওর কষ্ট হচ্ছিল বেশি। কি সান্ত্বনা দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না সেদিন। তবে যে কথাটি বোঝাতে চাইছিলাম তাহলো এজন্য ওর বিব্রত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং ওই মানুষজনদেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ওর কাছে। কারণ এতগুলি মানুষ তাদের অন্তরে সুপ্ত থাকা সহমর্মিতাবোধের এমন অমূল্য সম্পদটিকে খুঁজে পেয়েছে ওকে কেন্দ্র করেই। চারদিকের বিকৃতি ও বিপন্নতারূপ অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপের শিখার মতো কাজ করেছে জয়শ্রী।

এই কথাটি ফের একবার মনে হলো গত আটাশে নভেম্বর সন্ধ্যায়, জয়শ্রী-স্মরণসভায় গিয়ে। নতুনপল্লীর মাঠটি প্রায় ভরে উঠেছিল অজস্র বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতিতে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পাড়া প্রতিবেশীরা তো ছিলেনই। এছাড়াও বহু দূর দূর থেকে বহু মানুষজন এসেছিলেন খবর পেয়ে। অনেকে এগিয়ে এসে দু-চার কথা বলেছেন, স্মৃতিচারণ করেছেন। কয়েকজন তো জানালেন যে, জয়শ্রীকে তারা চোখেই দেখেন নি কখনও। তবুও এমন একটি উদ্যোগে সামান্যভাবে হলেও সামিল হতে পেরে ধন্য বোধ করছেন, তাই ছুটে এসেছেন আজ। সম্ভবত এত দীর্ঘ লড়াই চালাতে পেরেছে যে পরিবারের লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব তাদের প্রতি আন্তরিক

শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানাতেই। এই স্মরণসভাতে গিয়েই জানা গেল জয়শ্রীর মরদেহ দেওয়া হয়েছিল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংরক্ষণের জন্য। যেটা ব্যবহৃত হবে ছাত্র ও গবেষকদের কাজে। জয়শ্রীর সাথে ওর মা, দাদা, বৌদি, খড়দহ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ, নতুনপল্লী স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, গণবিজ্ঞান সমন্বয়ের বিভিন্ন সংস্থা এবং ভেলোরের গড়ে ওঠা সহমর্মী গোষ্ঠী—এদের সকলের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে থাকবে আমদের সকলের।

র.চ.

□□□□

বড়ই মজা জার্মানির বাচ্চাদের

এক বন্ধু পরিবার গিয়েছিল জার্মানিতে। গবেষণার কাজে। সাথে নিয়ে গিয়েছিল ওদের ছোট্ট বাচ্চাটিকেও। নিজেদের বাচ্চা সাথে থাকার কারণেই ওখানকার বাচ্চারা কিভাবে বড় হয় সেদিকে নজর গিয়েছিল। দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। কি স্ফূর্তিতেই না কাটায় ওখানকার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-গুলো।— আর আমাদের এখানকার বাচ্চারা? আমাদের সেই বন্ধুর জবানিতেই শোনা যাক সে কথা। ওদের একজন অজন্তা। একটি চিঠিতে ও কি লিখেছিল হুবহু তুলে দিচ্ছি।

‘এখানে বাচ্চাগুলো এত মজায় থাকে কি বলব। পাঁচবছর অবধি তো কিন্ডার গার্ডেনে গিয়ে শুধু খেলাধূলো করে আর ছবি আঁকে। তারপর স্কুলে যায়। পাঁচের পর ক্লাস ওয়ানে শুধু মুখে মুখে পড়তে হয়। ক্লাস টু থেকে এ বি সি লিখতে শুরু করে। বাচ্চাদের সাথে কথা বলে মনে হলো ক্লাস ফোরে গিয়ে যোগ বিয়োগ শেখে। ক্লাস ফাইভ অবধি হোমওয়ার্কের চাপ তো নেই-ই, এমন কি স্কুলেও পড়াশুনোর খুব একটা চাপ নেই।

নিচু ক্লাসে এরা প্রচুর ড্রয়িং করে এবং স্কুলে গিয়ে গান বাজনা শেখে। সকাল আটটা থেকে দেড়টা অবধি স্কুল। তারপর বাড়ি ফিরে খেয়ে-দেয়েই ওদের খেলা শুরু হয়। বৃষ্টি বাদলার জন্য সবসময় বাইরে না খেলতে পারলেও ঘরেই হই হই করে। জানালা দিয়ে আমি আঁশপাশের বাচ্চাগুলোর খেলা দেখি।— কি যে ভালো লাগে।

আর আমাদের ওখানকার বাচ্চাগুলোর কথা ভাব। গত কাল আমার বোনকে ফোন করেছিলাম। ওর কাছে শুনলাম যে, ওর ছেলের (বয়স ছয়-প্লাস) এবারে আঠেরো খানা বই। প্রতিদিন বেচারা হোমওয়ার্কের তাড়ায় খেলাধূলো তো করতেই পারে না। এমন কি ভালো করে ঘুমোতেও পারে না। টেনশনে! ছেলের পড়ার জন্য বাবাও ন'টার আগে বাড়িতে ঢুকতে পারে না। কারণ বাবা ফিরলে গল্প করে, তাই। বোঝো অবস্থা।

আমি এখানে আসার পর থেকে আমাদের দেশের বাচ্চাগুলোর অবস্থাটা খুব ভালো বুঝতে পারছি। বিশেষ করে প্রাইভেট স্কুলগুলোতে বাচ্চাগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। অনেক কিছু শেখায়, যার কোনো মানে নেই।

মাঝখান থেকে ছোটবেলা থেকে এত পড়ার চাপে এরা পড়াশুনো শেখার আনন্দটাই হারিয়ে ফেলে। আমাদের সময়ও বোধহয় এত পড়ার চাপ ছিল না ছোটবেলায়।

আমি এখানে না এলে হয়তো এটা নিয়ে এত ভাবতাম না। এখানে কোলন ইউনিভার্সিটির গেস্ট হাউসে থাকার সময় বিভিন্ন দেশের লোকজনের সাথে কথা বলে জানলাম যে, ইওরোপ বা আমেরিকার প্রায় কোনো দেশেই পাঁচবছরের আগে ‘লার্নিং’ শুরু হয় না। শুনলাম চীনেও বাচ্চাদের অবস্থা আমাদের দেশের মতোই।

আসলে এরা বাচ্চাদের মানসিক গঠনের ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দেয়। এখানে কেউ বাচ্চাদের মারে না। এরা বাচ্চাদের বায়নাগুলোকে ‘জাস্ট নেগলেক্ট’ করে। তবে এরা আমাদের থেকে অনেক বেশি বাচ্চাদের ঝামেলা সহ্য করে।

এই ব্যাপারটা আমার মাথায় এমন ঢুকেছে। অথচ কিছু করার নেই।

আমার জার্মান ক্লাস মোটামুটি চলছে। শেখাচ্ছেন খুব ভালো। এত সুন্দর যে পড়ানো হতে পারে, আমার ধারণাই ছিল না।’

আগেই বলেছি—এটা একটি চিঠি। এখানেই শেষ। ব্যাপারটায় এতটাই মুভড্ যে, অন্য কোনো বিষয়ের উত্থাপনই করে নি এই চিঠিতে।

র.চ.

গ্রাহকদের প্রতি

এই সংখ্যায় আপনার গ্রাহকপদ শেষ হচ্ছে। গ্রাহকপদ রিনিউ করে নিন। বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা এখন তিরিশ টাকা। মানি-অর্ডারে টাকা পাঠালে স্লিপে আপনার নাম ও ঠিকানাটা লিখতে ভুলবেন না।

ঘটনা প্রবাহ

□

একজন শিক্ষকের কাহিনী

চাকুরি জীবনের পেশা শিক্ষকতা। জাতির মেরুদণ্ড নির্মাণের কারিগর। অবসরের জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি। এমন আরও একটি সংবাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম। ডিসেম্বর মাসের বারো তারিখে এখানকার একটি বিশিষ্ট ইংরেজি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো সংবাদের শিরোনাম ছিল—Teach when in service. Beg when you retire। শ্রী প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক থেকে ভিখারি হয়ে ওঠার সচিত্র বিবরণ। আজও রোগজর্জর শরীরে প্রায় সত্তর বছরের প্রিয়ব্রতবাবু ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে রোজই বেরিয়ে পড়েন, সোদপুর ঘোলা অঞ্চলের অমরাপুরী থেকে সকাল হতে না হতেই। বিরানব্বই সালের পর থেকেই ষাট-পঁয়ষট্টির টানাপোড়েন শুরু। পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত চাকুরির জন্য অপশন দিলেও শেষ পাঁচবছরের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ মাসেরই মাইনে পান নি। সাতানব্বই এর মে থেকে বিনে মাইনের চাকুরিও শেষ। তারপর দীর্ঘদিন বকেয়া মাইনে, অবসরকালীন পাওনাগণ্ডা নিয়ে ছোটাছুটি। চারজন মানুষের মুখে অন্ন জোগানোর পাগল করা চিন্তা। সবশেষে লোকের কাছে করুণা ভিক্ষা। কখনো সোদপুর স্টেশনে, কখনো শিয়ালদহ, কখনো-বা অন্য কোথাও। সঙ্গে সরকারি দপ্তরে লেখা চিঠি-চাপাটির প্রতিলিপি, বঞ্চনার দীর্ঘ খতিয়ান।

রবিবার সকালের সংবাদটিকে আর পাঁচটা সংবাদের মতোই নিলেন অনেকে। এমন তো কতই হয়। দুঃখ পেলেন অনেকেই। যাঁরা আরও একটু এগিয়ে কিছু করার কথা ভাবলেন তাদের একজন শ্রী টি কে সরাফ। সল্ট লেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্ণধার। প্রিয়ব্রতবাবুর ঠিকানা খুঁজে বার করলেন। চেষ্টা করলেন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করারও। প্রিয়ব্রতবাবুর সন্ধানে সোদপুর স্টেশনে ছুটে গেলেন পেশায় ডাক্তার শ্রীমতী দীপা চট্টোপাধ্যায়। খুঁজে না পেয়ে হতাশ হলেন। সাহায্য নিয়ে প্রিয়ব্রতবাবুর বাড়ি হাজির হলেন সল্ট লেকের এক শিক্ষিকা। কাগজের অফিসে সাহায্যের প্রস্তাব এল গৌহাটি নিবাসী এক অধ্যক্ষের কাছ থেকে। জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা করে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সরকারকে অবিলম্বে পেনশন দেবার নির্দেশ আদায় করলেন শ্রী প্রলয় হীরা নামের এক সমাজসেবী। দীর্ঘকাল পেনশন না পাওয়া হাজার হাজার শিক্ষককে আইনী লড়াই চালিয়ে সরকারকে ন্যায্য পাওয়া মিটিয়ে দিতে বাধ্য করার বিষয় নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে।

শ্রী সরাফের সঙ্গে দেখা করার বার্তা, সাহায্যের প্রস্তাব এ সব প্রিয়ব্রতবাবুকে বেশি নাড়া দিতে পারে নি গোড়ার দিকে। ঠুনকো আশ্বাস, নিষ্প্রাণ সমবেদনা অনেক দেখেছেন জীবনে। তার ওপর জমা হয়েছে শরীর-মন নিয়ে আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি। শ্রী সরাফ নিজেই ছুটে গেলেন অমরাপুরী। সঙ্গে দুটো কম্বল, দুটো করে পাজামা-পাঞ্জাবি, এক জোড়া ধুতি, এক জোড়া শাড়ি, পাঁচশোটাকা, আর প্রতিমাসে পাঁচশো টাকা বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি। একটাই আক্ষেপ শ্রী সরাফের। প্রিয়ব্রত সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা হলো না তাঁর। তিনি পৌঁছনোর অনেক আগেই ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন 'স্বর্গপুরী'র গর্বিত আবাসিক, মেরুদণ্ড নির্মাণের ক্লান্ত কারিগর।

মানস কুমার জোয়ারদার

□□

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বৈঠক ঘিরে বিক্ষোভ

বিগত সহস্রাব্দের শেষ দশকের আগে গ্যাট (GATT) কাকে বলে একটা ক্যুইজের প্রশ্ন ছিল। '92 থেকে আর নয়, গত ডিসেম্বর থেকে তো নয়ই। '92-এ উরুগুয়েতে যার শুরু, '95 তে ম্যারাকেশে নতুন চেহারায় তার আবির্ভাব, এখন নাম WTO (World Trade Organisation)। বর্তমান সদস্য সংখ্যা 135, অপেক্ষায় আছে আরও গোটা তিরিশেক দেশ।

কাজ কি WTO-র? প্রধানত অবাধ বাণিজ্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া, সারা পৃথিবীকে এক বাণিজ্যনীতির আওতায় আনা। কথাগুলো শুনতে ভালোই, যখন দেখি '90 এর গোড়ায় ভারতের আমদানি-রপ্তানি বিশ্বের বাণিজ্যের 0.5% মাত্র। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরি হলো না। উরুগুয়েতে যেসব কথাবার্তা শুরু হয়েছিল— চাল, ডাল, তেলের মতো information বা তথ্যে দাম ধরা, পেটেন্ট নেওয়া ও চড়াদামে সেই পেটেন্ট বিক্রি, নতুন নতুন ফসল, ওষুধপত্রে পেটেন্ট নেওয়া— শিগ্‌গিরই ধনী দেশগুলোতে তার আইনী স্বীকৃতি, ফলে গরীব

দেশগুলোর কাছে এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও জিনিসপত্র অধরা থেকে যাওয়া, এসবই রূঢ় বাস্তব হয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া দেশের জন্য কারো কাছে হাত পাতলে সে যদি বলে কিভাবে তোমাদের দেশ চালাবে তাও আমরা বলে দেব, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না কি? কিছু দেশে, বিশেষ করে আফ্রিকায়, ঋণদাতাদের পরামর্শমতো পরিবর্তন আনতে গিয়ে যা খরচ হয়েছে তা সে দেশের সারা বছরের বাজেটের চেয়ে বেশি।

বিদেশীদের খাঁই মেটাতে— তা ঋণের সুদের টাকাই হোক বা তাদের হুকুম-মতো অনাবশ্যক জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য হয়েই হোক— দেশের অর্ধেকের বেশি টাকা যখন বাজে খরচে যায় তখন স্বাভাবিকভাবে চেষ্টা চলে রপ্তানি বাড়ানোর। এ-ব্যাপারে আমাদের সবচেয়ে বড় মূলধন সস্তার শ্রমিক। ফলে পোশাক আশাক, চাষীর ফসল, চামড়ার জুতো খুব সস্তায় সারা পৃথিবীতে রপ্তানি হতে পারে। এখানে আবার ধনী দেশগুলো নিজেদের দেশের বাজার আটকে রাখে বাইরের কাছে। বাইরে থেকে সস্তা জিনিস যাতে সহজে না আসতে পারে তার জন্য আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয়, কোটা বসানো হয়, নয়তো আমাদের দেশের শ্রমিকদের দুর্দশার কথা ভেবে তাঁরা কুম্ভীরাশ্রু ত্যাগ করেন এবং ঘোষণা করেন 'ওদের দেশে শ্রমিকদের মাইনে না বাড়ালে, তাদের অবস্থা ভালো না হলে শিশুশ্রম বন্ধ না হলে ও দেশ থেকে আমরা জিনিস কিনব না'। এগুলো ঠিক অবাধ বাণিজ্যনীতির মধ্যে পড়ে না।

এইসব নানা ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য পয়লা থেকে তেসরা ডিসেম্বর WTO-র অধিবেশন বসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন রাজ্যের সিয়াটল শহরে, যে শহর এক সময়ে বোয়িং এরোপ্লেনের জন্য ও বর্তমানে বিল গেট্‌সের শহর বলে বিখ্যাত। 30 নভেম্বর থেকেই গণ্ডগোল শুরু। পরের দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য জোর তোড়জোড়, কর্তাদের ঘন ঘন মিটিং, তার মধ্যে প্রায় 40,000 বিক্ষোভকারী জমা হয়েছিল অধিবেশন যেখানে হবে তার বাইরে রাস্তায়, পুলিশের নিষেধ সত্ত্বেও। এদের মধ্যে কয়েক হাজার ওদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন সমষ্টির, AFL-CIOর সদস্য। তারা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল, তাদের চাহিদা হলো বাইরের জিনিস ওদেশে কম আসুক, তারা WTOর মধ্যে সস্তা শ্রমিকদের অবস্থা ফেরানোর দাবি ঢোকাতে চাইল। বাকিদের অধিকাংশই নানান special interest group-এর লোকজন। কেউ GM (জেনেটিক পরিবর্তন ঘটানো) ফসলের বিরুদ্ধে, কারুর ক্ষোভ ধনী দেশগুলোর বঞ্চণার ব্যাপারে, কেউ চান Intellectual Property Rights তুলে দেওয়া হোক, কেউ বা অত্যাবশ্যক ওষুধপত্র পেটেন্ট আওতার বাইরে রাখার পক্ষে। এরা প্রায় সকলেই মাঝবয়সী, ভদ্র পোশাক পরা, সঙ্গে প্রচুর মহিলা ও শিশুও ছিল। কেউ শিক্ষক, কেউ বা কারখানার শ্রমিক, কেউ ডাক্তার, কেউ পাইলট, কারো কাজ জাহাজঘাটায় বা কামারশালায়। মিটিং-বাড়ির সামনে এরা শান্ত হয়ে বসেছিল, কেউ বক্তৃতা দিচ্ছিল, কেউ বা গান গাইছিল।

এদের মধ্যে শখানেক লোক ছিল অ্যানার্কিস্ট, কাছের ওরেগন রাজ্যের ইউজিন শহরের একটি কমিউন থেকে আসা এই লোকগুলি মাথায় মুখোশ পরে কিছু দোকানপাট ভাঙচুর করে বা লুঠ করে আর অনেক জায়গায় স্প্রে করে স্লোগান (গ্রাফিটি) লেখে বা ওদের চিহ্ন, ইংরাজি A অক্ষর এঁকে দেয়। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে ভাঙচুর ও লুঠতরাজ প্রথমদিকে সামান্যই হয়, পুলিশ তাদের ওপর তাণ্ডব চালানোর অজুহাত হিসেবে। ওটা বাড়িয়ে বলে। কেউ কেউ আবার এও বলেছেন যে ওরা স্থানীয় সমাজবিরোধী মাত্র, হয়তো-বা বড় ব্যবসায়ীদের আশ্রিত। মোট কথা এই গণ্ডগোলের মধ্যেই দেখা গেছিল যে, অধিকাংশ অবস্থানকারী নিজেদের লোকদের শান্ত হয়ে বসে থাকার জন্য আবেদন করছেন। এর মধ্যে পুলিশ হঠাৎই তাদের কাজ শুরু করে— কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া, রবার বুলেট ও গ্রেনেড (যা কেবল ধাক্কা দেয়), মরিচগুঁড়ো এমনকি নার্ভ গ্যাস পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। তার কারণ পরদিন অনেকেই পেশীতে আড়ষ্টতা, অসাড়তা, গা বমি ইত্যাদি বোধ করেন। এসব করার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। হয়তো দুচারটে ইট পাটকেল পড়েছিল। পুলিশ ধরপাকড়ও শুরু করে দেয়। সেই রাত থেকে মেয়র পল শোল কারফিউ জারি করে দেন। কিন্তু তাতে বিক্ষোভ সামলানো যায় নি। যেসব ডাক্তার অসুস্থ বা আহতদের চিকিৎসা করেন তাঁরা জানিয়েছেন যে, রবার বুলেট হোক বা যাই হোক, অনেকেরই আঘাত গুরুতর হয়েছিল। কারও চোয়াল ভেঙেছিল, কারও হাত বা পা। তার মধ্যে পুলিশের অত্যাচার তো আছেই। কীথ হোমস বলে একজনের চুল ধরে টেনে পুলিশ একগাছা চুল উঠিয়েই ফেলে, তারপর কংক্রিটে তার মাথা ঠুকে দেয়, সে কেবল নিজের নাম জানাতে অস্বীকার করেছিল বলে। অবশেষে মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন হচ্ছে বলে তাকে ছেড়ে দিতে পুলিশ বাধ্য হয়। CNN এ ছবি দেখায় পুলিশ বুট দিয়ে একজনের মাথা চেপে ধরে আছে, লোকটি মাথাটা ইঞ্চিখানেক নড়ালেই বুট দিয়ে আবার চেপে ধরা হচ্ছে।

এ রকম ব্যাপার পরদিন পর্যন্ত চলাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল হয়, বাতিল হয় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সমতে কয়েকজনের বক্তৃতা। মেয়র কারফিউ জারি রাখেন অধিবেশনের শেষদিন (তেসরা ডিসেম্বর) পর্যন্ত। পুলিশকর্তা নর্ম স্ট্যাম্পার ঘোষণা করেন পুলিশ আরও কড়া হাতে বিক্ষোভ দমন করবে। ধরপাকড় বাড়তে থাকে। দোসরা ডিসেম্বর দুশো জন, তেসরা ডিসেম্বর প্রায় শ-পাঁচেক লোক সিয়াটলের কিং-কাউন্টি জেলে ছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে বাড়তে থাকে বিক্ষোভ। রাস্তায় রাস্তায় লোকজন চিৎকার করেন, কেন কালো লোকদের বেশি ধরা হচ্ছে। দোসরা ডিসেম্বর হাজার দুয়েক, পরদিন তার দ্বিগুণ সংখ্যক লোক হাত ধরাধরি করে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে জেলের সামনে বিক্ষোভ দেখান ও ধৃতদের ছেড়ে দেবার দাবি জানান। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক গ্লোবালাইজেশন ফোরামের ভিকটর মেনোত্তি WTO অধিবেশনের একজন অতিথি ছিলেন। তিনি যখন বিক্ষোভকারীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন পুলিশ এসে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। ভিকটর মেনোত্তি-র আর খোঁজ মেলে নি।

এর মধ্যে, খুব সম্ভবত নিজের দেশের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির চাপে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন শ্রমিক আইনগুলি WTOর মধ্যে ঢোকাতে চাপ দিচ্ছিলেন। যেসব গরীব দেশ GM ফসল বায়োটেক বা অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো পেটেন্ট আওতার বাইরে রাখতে চেয়েছিল তাদের ওপর চাপ দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু ধনী দেশগুলোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে শ্রমিক আইনগুলি WTOর মধ্যে ঢোকানো গেল না। যদিও এবছর জানুয়ারিতেই WTOর হেড অফিস জেনিভায় আবার অধিবেশন বসবে, তার পরিধি অনেক সীমিত। এই প্রেক্ষিতে আমাদের মতো দেশের কি করা উচিত তা ভাবা দরকার। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দেনায় বিকিয়ে গেছে, এখন ভাত-ডাল বা দরকারী ওষুধপত্র কিনতে গেলেও হয়তো দেখা যাবে সামর্থ্য নেই। আমাদের দেশের গাছপালা থেকে তৈরি জিনিস বিদেশে পেটেন্ট হয়ে দেশে ফিরে আসবে বহুগুণ দামে। আমরা কতদিন রামরাজ্যের কথা ভাবতে ভাবতে আঙুল চুষবো?

অশোকপ্রসূণ চট্টোপাধ্যায়

2000-এর বইমেলায় ছাতার তলায়
আবার আমাদের দেখা হবে
পুরনো নতুন বন্ধুদের সঙ্গে

পুস্তক পর্যালোচনা

'বিজ্ঞান কোষ' কথা

'চারু প্রভাদেবী শিক্ষা সংসদ' নিশ্চয় প্রচার ও খ্যাতি অখ্যাতি থেকে বহু দূরে থাকতে চাওয়া একটি ক্ষুদ্র ব্যতিক্রমী সংস্থা, নাম থেকে মালুম হয়, কাম থেকেও। না হলে বাংলায় *বিজ্ঞান কোষ* সংকলন ও প্রকাশনার দুরূহ কাজে হাত দিতেন না। জনপ্রিয়তা ও প্রচারের আলোয় আসার জন্য 'শিক্ষা' নিয়েও বহু রকমের 'কাজ' থাকা সত্ত্বেও *বিজ্ঞান কোষে* আগ্রহী হবার কারণ এঁদের কথাতেই শোনা যাক : 'শুধু পরীক্ষায় ভালো করাটাই লেখাপড়ার একমাত্র প্রেরণা বা motive force হতে পারে না, এই ধারণা আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড থেকে প্রায় মুছে যেতে বসেছে। ... উৎসুক ও আগ্রহী মন নিয়ে যখন কোনো ছাত্র বিজ্ঞানচর্চা করে তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও তার অনেক কিছু জানবার ইচ্ছা করে। দুরূহ বিষয় সম্বন্ধেও সামান্য আলোকপাতে মানসিক উদ্দীপনা ঘটে।.....' এরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'সক্রিয় ও গঠনমূলক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত' ঘটানোর লক্ষ্যে বিজ্ঞান অভিধানের মতো একটি 'কঠিন কাজে' তাঁরা ব্রতী হয়েছে। অত্যন্তই শ্লাঘার কথা।

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, সংখ্যাতত্ত্ব, কম্পিউটার বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা ও কৃষিবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট প্রায় 1800 মূল শব্দের পরিচয় ও ব্যাখ্যা তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বইটিতে, প্রায় 70 হাজার শব্দে। শব্দ নির্বাচনে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান সংবাদ ও প্রবন্ধে প্রায়ই ব্যবহৃত শব্দগুলিকে যথাসম্ভব রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে 'বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের' সহযোগিতাকে গ্রোথিত ও সম্পাদিত করেছেন সংসদের কর্মীরা। তাঁরা একাজে প্রাথমিকভাবে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ বই-এর বহুল প্রচার ও ব্যবহার অবশ্যই কাম্য। কিন্তু বাস্তবে তা যে কত বড় দুরাশা তা বোঝেন তাঁরাই, যাঁরা এমন উদ্যোগ নিয়ে ফেলেন। সংসদের কর্মীদের তাই এ-ব্যাপারেও বাড়তি উদ্যোগের প্রয়োজন হবে।

বিজ্ঞান কোষ
সংকলন ও সম্পাদনা : চারুপ্রভাদেবী শিক্ষা সংসদ,
দ্য বুক ট্রাস্ট, 57B কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা 700 073,
184 পৃষ্ঠা।। মূল্য : আশি টাকা

আশা করা যাক *বিজ্ঞান কোষ*টির সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং উত্তরোত্তর এর শ্রী ও পরিধি বিস্তৃত হবে। সেদিকে তাকিয়ে গুটিকয়েক কথা :

'চারুপ্রভাদেবী শিক্ষা সংসদ' অবশ্যই শ্রদ্ধা উদ্রেক করে, এবং পাঠককে কৌতূহলী করে এঁদের ঠিকানা-পরিচয়-কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে, কিন্তু হতাশ হতে হয়।

'একই শব্দের বিভিন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থ থাকলে পৃথকভাবে তার আলোচনা করা হয়েছে, বন্ধনীর মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের নাম (সাংকেতিক) উল্লেখ করা হয়েছে'—'ছাত্রছাত্রীদের নিকট...... দু একটি কথা' প্রসঙ্গে এই কথা বলা হলেও বইতে কিন্তু বিজ্ঞানের শাখা ('বিভিন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্র' বলতে নিশ্চয়ই বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাকেই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে?) চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে মাত্র দু-একটি ক্ষেত্রেই। Equilibrium শব্দ প্রসঙ্গে তাপজাতীয় ভৌতসাম্য ও তার শর্তাদি উল্লেখ করা হলেও, রাসায়নিক সাম্যের উল্লেখ নেই।...... পৃথকভাবে অল্প কয়েকটি চিত্র আছে বই-এর গোড়াতেই। ভেতরে যে শব্দ প্রসঙ্গে ঐ চিত্রগুলিকে দেখার কথা সেখানে দেওয়া চিত্রসংখ্যা আর চিত্রে ব্যবহৃত সংখ্যায় মিল থাকে নি যেমন শব্দের সঙ্গে বলা হয়েছে চিত্র L_2, L_3 দেখুন। চিত্রে তাদের পরিচিতি fig.1, fig.2 হিসেবে। দুটি ক্ষেত্রে চিত্র আছে, কিন্তু ভেতরে শব্দ নেই (Alimentary canal—fig.1; Agrand Diagram' M,)

শব্দনির্বাচনের সমস্যা সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলী অবহিত । কিন্তু তাঁদেরই নিরিখে ('প্রায়ই ব্যবহৃত শব্দ'), Environment বোধহয় বাদ পড়ার মতো শব্দ নয়। Ornithology খুব প্রচলিত না হলেও যেমন সঙ্গতভাবেই নির্বাচিত হয়েছে, তেমনি Tribology'ও স্থান দাবি করে না কি?

'প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ থাকলে তা দেওয়া হয়েছে', 'অপ্রচলিত বাংলা পরিভাষা' বরং বিষয়টিকে বুঝতে 'অসুবিধা' ঘটাবে—বলা হয়েছে 'দুএকটি কথায়'। কিন্তু 'কিডনি'র পরিভাষা 'বৃক্ক' পরিহার করলে 'অ্যাগেট' এর পরিভাষা হিসেবে 'অকীক' কি অপরিহার্য? তাছাড়া, পরিভাষা প্রচলিত না অপ্রচলিত তা কিভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে? বেশ কয়েকটি পরিভাষা সংকলন আছে বাংলায়, সেগুলির কোন্‌টি বা কোন্ কোন্‌টি অনুসৃত হয়েছে, উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। Cell এর বাংলা হিসেবে 'কোষ' তো বেশ প্রচলিতই মনে হয় এবং বই-এর এক জায়গায় সেরকম ব্যবহৃতও হয়েছে, তাহলে Cell-এর পরিভাষা হিসেবে 'কোষ' উল্লেখ করায় আপত্তি কোথায়? Crystal যদি কেলাস হয়, crystallography-কে 'কেলাসবিদ্যা' কেন বলা যাবে না?

কয়েকটি ক্ষেত্রে—যা নজরে পড়েছে—শব্দের অর্থবৈষম্য ঘটেছে। Ecology কি 'পরিবেশ বিজ্ঞান'? Creep শব্দের পরিচয় বোধহয় যথাযথ হয় নি। Plastic deformation এবং Creep সমার্থক নয় এবং শুধু কেলাসেরই হয় এমনও নয়। Creep হলো উচ্চতাপমাত্রায়(আপেক্ষিক) সময়ভিত্তিক স্থায়ী বিকৃতি।

মুদ্রণপ্রমাদ অল্প; তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সংশোধন দাবি করে। যেমন, Moh's scale (মুদ্রিত soule, পৃ.93), Kaoline (পৃ.108) ভুল না হলেও Kaolin বানানই সমধিক প্রচলিত। আর এটিই যে China clay বা চিনেমাটির মূল উপাদান তারও উল্লেখ প্রয়োজন, (China clay শব্দটিও শব্দকোষে নেই)। Exothermic শব্দ exthermic (পৃ.75) ছাপা হলে অনেকেই এই শব্দটিকে সঠিক বলেই ভুল করতে পারেন।

পরিশেষে আর একটি কথা। তরুণ ও উৎসুক মনের উদ্দীপন ব্যাপকভাবে ঘটানোর জন্য বোধহয় বিজ্ঞানকে তাদের জীবনেও নিয়ে যাওয়া দরকার। এবং জীবনের বিজ্ঞানের কোনো সীমানা নেই। ইতিহাস-ভূগোল-সমাজ-অর্থনীতি-উন্নয়ন-পরিবেশ-জীববিদ্যা-রসায়ন-পদার্থবিদ্যা-গণিত-জ্যোর্তিবিদ্যা সেখানে কত সহজে একটা আর একটায় বিলীন হয়। আসলে সবকিছুই তো সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কারণ সবকিছুই মানুষের ক্রিয়ার ফসল। অবশ্য এভাবে দেখলে *বিজ্ঞান কোষে*-র শব্দের বাছাই-এর আর প্রয়োজন থাকে না হয়তো। কিন্তু কথাটা বলছি এ-কারণে যে *বিজ্ঞান কোষ*-কে 'কঠোরভাবে বিজ্ঞান' (hard science)-এ সীমিত রাখতে চাইলে, তা যেমন অনেকটা কৃত্রিম হতে বাধ্য, তেমনি বিজ্ঞানকে হাত ধরে নতুন নতুন সম্ভাবনার দরজায় পৌঁছে দেওয়া বা তরুণ শিক্ষার্থীর মনের উদ্দীপন ঘটানোও বোধহয় ব্যহত হয়। Resources, Management, Sustainable Development, Sexology, Astrology, Asbestosis, Arsenicosis, Fluorosis —ইত্যাদি কি অবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান বলে বর্জনীয়?

শব্দ বাছাই সম্পাদকের এক্তিয়ার, মানছি। এবং আলোচ্য বিজ্ঞান শব্দকোষটি যে সত্যিই 'উদ্দীপক' হিসেবে কাজ করেছে এমনও অস্বীকার করার উপায় নেই!

র.ম.

চি ঠি প ত্র

সম্পাদকমণ্ডলী
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*র সম্পাদকীয় আড্ডায় পিটার ক্রপটকিনের নাম শুনেছিলাম অনেকদিন আগেই। কিন্তু এতদিন ওঁর লেখা পড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়ে ওঠে নি। *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-র জুলাই-সেপ্টেম্বর 1997 সংখ্যায় ক্রপটকিনের জীবন ও চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রকাশিত লেখাগুলোর কল্যাণে অবশেষে সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়ে উঠল। এজন্য *বি.ও.বি*-র প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু ক্রপটকিনের বহু আলোচিত বইটি পড়তে গিয়ে প্রথমেই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, *বি.ও.বি.*-তে একবারও বইটির সঠিক নাম ছাপা হয় নি। বইটির নাম *Mutual Aid : A Factor of Evolution*। অথচ *বিওবি*-তে নানা জায়গায় লেখা হয়েছে *Mutual Aid : A Factor in Evolution*। এমনকি ক্রপটকিনের নাম পর্যন্ত ভুলভাবে লেখা হয়েছে। স.চ. লিখেছেন, ক্রপটকিনের পুরো নাম 'প্রিন্স পিটার আলেকজান্ডার ক্রপটকিন'। অথচ ওঁর প্রকৃত নাম পিটার আলেক্সেভিচ (Alexeyvich) ক্রপটকিন। আলেকজান্ডার (Alexander) ক্রপটকিন ওঁর (এক বছরের বড়ো) ভাইয়ের নাম। আশা করি, ভবিষ্যতে ক্রপটকিন-চর্চায় *বিওবি* আরো যত্নবান হবে।

স.চ.-র লেখায় ক্রপটকিনের স্ত্রীর উল্লেখ রয়েছে মাত্র দুটো লাইনে : এক, (ক্রপটকিন সুইজারল্যান্ডে)... "বিবাহ করলেন সোফি এনানিরেভ নামে এক মহিলাকে"...। দুই, (ক্রপটকিনের) "মৃত্যুশয্যায় পাশে ছিলেন শুধু স্ত্রী সোফি, কন্যা, জামাতা কয়েকজন বন্ধু।" *Mutual Aid : A Factor of Evolution* বইটির মুখবন্ধে (Foreword) অ্যাশলে মন্টাগু যা লিখেছেন, তা থেকে সোফি অ্যানানিয়েভ (Sophie Ananiev—*বি.ও.বি.*-তে ভুলভাবে ছাপা হয়েছে) সম্পর্কে কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। সোফির বাবা একটি স্বর্ণখনি দেখভাল করতেন (operated a gold mine)। খনির পরিচালনব্যবস্থা খনির শ্রমিকদের যে অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য করে, তা সোফিকে পীড়িত করত। সতেরো বছর বয়সে তিনি আর খনিশ্রমিকদের শোষণের মূল্যে অর্জিত অর্থে বেঁচে থাকতে চাইলেন না। সোফি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন জীবিকার সন্ধানে। সোফির জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির উল্লেখ স.চ.-র লেখায় থাকলে ভালো হতো।

পুরো ইকোলজিকাল সিস্টেম-এর (ecological system) বিবর্তন এবং তার প্রক্রিয়া এতই জটিল যে তাকে বোঝার জন্যে কোনো সর্বসম্মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এখনও উদ্ভাবিত হয় নি। এই বিবর্তনে mutual aid-এর কোনো ভূমিকা হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু তার প্রকৃত রূপ, জটিলতা এবং অর্থ ক্রপটকিনের পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তের অনুসারী নাও হতে পারে।

অ্যাশলে মন্টাগু-র লেখার যে অনুবাদ *বি.ও.বি.*-তে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে রয়েছে : "ক্রপটকিন তাঁর এই বইয়ে (*Mutual Aid : A Factor of Evolution*) দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, অদৃশ্য একটি শক্তি যেন গোটা জৈব জগৎ জুড়ে বিদ্যমান সর্বদা, যা প্রত্যেক ধরণের প্রাণের টিকে থাকায় বড় আকারে সাহায্য করে।" এ-জাতীয় ধারণার সত্যিমিথ্যা যাচাই করা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। প্রসঙ্গত, এ-জাতীয় একটি মিস্টিক (mystic) ধারণা ইদানীং "ecologist" মহলে ফ্যাশনেবল হয়েছে [James E. Lovelock এবং Lynn Margulis প্রবর্তিত গেইয়া সংক্রান্ত ধারণা (Gaia hypothesis)]।

সাধারণ জনমানসে ডারউইন-ওয়ালেসের বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে বেশ কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। 'ডারউইনের তত্ত্ব' বলতে বহু লোক কেবল 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' এবং 'যোগ্যতমের টিকে থাকা'-কেই বোঝেন। এবং 'সংগ্রাম' ব্যাপারটিকে স্থুল লড়াই হিসেবে মনে করেন। অথচ, ডারউইন-ওয়ালেসের তত্ত্ব অনুসারে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে একই প্রজাতির বিভিন্ন জীবের (individual) মধ্যে দেখা দিচ্ছে বৈচিত্র্য— একে অন্যের থেকে কোনো না কোনোভাবে আলাদা (variation)। এইসব আলাদা আলাদা জীবের মধ্যে সেগুলোই টিকে থাকার দৌড়ে এগিয়ে থাকে, যারা যোগ্যতম বা best fit। এই best fit বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয় যারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, খাদ্য আহরণ এবং প্রজননে সবচেয়ে বেশি সক্ষম। এসবের জন্য সবসময়েই যে নিজেদের মধ্যে স্থূল লড়াই করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পতঙ্গের কোনো প্রজাতির মধ্যে variation-এর ফলে এমন কোনো সদস্যের জন্ম হতে পারে, পরিবেশের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকার [ক্যামোফ্লাজ (camouflage) করাব] ক্ষমতা যার বেশি। এক্ষেত্রে একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে কোনো 'লড়াই' ছাড়াই ঐ সদস্যটি টিকে থাকা এবং বংশ বৃদ্ধিতে বেশি

সফল হবে। একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে যে সংগ্রামের কথা বলা হয়ে থাকে, সে লড়াইয়ে সাফল্যের চাবিকাঠি favourable variation।

আর পাঁচটা প্রাণীর সঙ্গে মানুষের প্রভূত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য প্রাণীদের থেকে তাকে আলাদা করে। প্রথমত, মানুষ সামাজিক প্রাণী, দ্বিতীয়ত, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে সে তার বেশিরভাগ প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। *On the Origin of Species by Means of Natural Selection* বইতে ডারউইন মানুষের বিবর্তন নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন নি। মানুষের বিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান মূলত ডারউইন-পরবর্তী সময়ের নৃবিজ্ঞানীদের (anthropologists) কাজ। সামাজিক ও সচেতন প্রাণী হওয়ার কারণে বিবর্তনের প্রাকৃতিক নিয়মই মানুষের বিবর্তনের নিয়তি নয়। এ-বিষয়ে আজ সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই যে, মানুষের বিবর্তন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নয়—একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াও। তবে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলোর কোন্‌টার অবদান মানুষের বিবর্তনে কতখানি এবং এরা কিভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করে, সেকথা বলার সময় এখনও আসে নি।

ক্রপটকিনের লেখা পড়ে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয়েছে, সামাজিক প্রাণী হিসেবে মানুষের অনন্যতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে বিশেষ সম্পর্ক মানুষের বিবর্তনকে অন্যসব প্রাণীদের বিবর্তন থেকে আলাদা করেছে, ক্রপটকিন সম্ভবত তা অনুধাবন করতে পারেন নি। মানুষকেও আর পাঁচটা প্রাণীর মতোই দেখার ফলে ডারউইন তত্ত্বের সামাজিক অপপ্রয়োগ (Social Darwinism) রুখতে গিয়ে তাঁকে এমন এক তত্ত্বের অবতারণা করতে হয়েছে, যা পারস্পরিক সহযোগিতাকে জীবমাত্রেরই স্বভাবধর্ম (inmate nature)হিসেবে ধরে নেয়। ঐ তত্ত্ব অনুসারে, সহযোগিতা মানুষের স্বভাবধর্ম এবং তা জীব হিসেবে তার বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ মাত্র। ক্রপটকিনের সমসাময়িক-কালে সামাজিক ডারউইনবাদের অন্যতম অ্যাপ্রোচ ছিল মনুষ্যের প্রাণীজগতের নিয়মকে মানুষের সমাজে নির্বিচারে প্রয়োগ করা। সাম্প্রতিক কালে প্রাণীদের আচার-আচরণ-সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাবধর্ম (human nature) সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সোশিও-বায়োলজিস্টদের একটি মহল (যেমন, সোশিও-বায়োলজির সুপারস্টার এডওয়ার্ড উইলসন (Edward O. Wilson) সচেষ্ট। এ-প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, ক্রপটকিন সামাজিক ডারউইনবাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সোশিও-বায়োলজিস্টদের একাংশের অথবা সামাজিক ডারউইনবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন্‌ মৌলিক অর্থে আলাদা? কেবল মানুষের 'সহজাত সহযোগিতা'-র ধারণাটি তুলে ধরার জন্যে কি?

সুদীপ্ত সরস্বতী
মুম্বাই

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরেজী
প্রকাশনার স্থান	:	P 252 লেক টাউন, কলকাতা 700089
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ, 92, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা 700 009
মুদ্রকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117 কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে উপরিউক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বা : রবীন মজুমদার,
প্রকাশক, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

VIJNAN O VIJNANKARMI Rn. No. 34929/79 Rs. 7.50

Vol XXI No.4 OCTOBER-DECEMBER 1999

পোখরান বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত

নিউক্লিয়ার বোমা নয়

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

■ ■

মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার পঞ্চাশ বৎসর উপলক্ষে প্রকাশিত

রাষ্ট্রসংঘের মানবিক-অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা

মূল্য : পাঁচ টাকা

■ ■

রবীন মজুমদার-এর

পরিবেশ বিষয়ে প্রবন্ধ সংকলন

পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ

মূল্য : ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : বুক মার্ক, নিউ হরাইজন, উৎস মানুষ

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী, পি 252, লেক টাউন, ব্লক A, কলকাতা 700 089

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117 কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009 থেকে মুদ্রিত।